এই আমি একা অন্য

Praise this world to the Angel, not the untellable: you can't impress him with the splendour you've felt; in the cosmos where he more feelingly feels you're only a novice. So show him some simple thing, refashioned by age after age, till it lives in our hands and eyes as a part of ourselves. Tell him things. He'll stand more astonished: as you did beside the roper in Rome or the potter in Egypt.

Ninth Elegy. (Duino Elegies)
Rainer Maria Rilke

True, it is strange to inhabit the earth no longer, to use no longer customs scarcely acquired, not to interpret roses, and other things that promise so much, in terms of a human future; to be no longer all that one used to be in endlessly anxious hands, and to lay aside even one's proper name like a broken toy.

First Elegy. (Duino Elegies)
Rainer Maria Rilke

Open a rose in my flesh
Though a thousand thorns it have
Upon my barren flesh
One rose of all the wonder

Yerma. Lorca

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি.........

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কতকগুলো স্মৃতিকে, কতকগুলো স্বপ্নকে,

......কতকগুলো মৃত্যুকে......

কতকগুলো ভাবনাকে, এবং কতকগুলো
মানুষকে......

আঁদ্রে মালরো
সন্তোষকুমার ঘোষ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
আবদুল জলিল
ডিনা জিজিবয়
বিক্রম নায়ার
তীর্থংকর মুখোপাধ্যায়
বিশ্বজিৎ, বাসু
কবিতা সিংহ
পিয়ালী সেন, মহুয়া ইন্দোলকার॥

●

পায়ের ওপর পা। পরমেশ্বরী। এই ছিল রূপা। দুটি ভিন্ন মেরুর মানুষ পাশাপাশি বসে, পায়ের ওপর পা। আবদারের ভঙ্গীতে, চোখে চোখ রেখে রূপাকে বলছিলুম, আমি সুইসাইড করতে পারি। আমার কোন কথাই ও আমল দিত না কিংবা বড় বেশী দিত ; তাই বলল, আমিও সুইসাইড করতে পারি। চকিতে ব্যাপারটা একটা কি না কি হয়ে গেল। যেন এতক্ষণ আমরা আমাদের পারাপারির কথাই বলছিলুম।

ঠিক আড়াই বছর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সেমিনার ঘরে রূপাই কথাটা ভাঙল, আমি সুইসাইড করতেই যাচ্ছি। তবে গলায় দড়ি দিয়ে নয়, জলে ডুবে নয়, শুধু তোমার থেকে অন্য ধরনের একটা মানুষকে বিয়ে করে। সে হাক্সলি পড়ে না, পাস্কাল বোঝে না, ইয়েটসের তোয়াক্কা করে না। আর সে তোমার মত বাজে বকে না অনর্গল। তাকে স্বামী বলে ঠাওর করা যায়। বুঝেছ? হ্যাঁ, সে আবার ভীষণ সোশ্যাল, যা তুমি নও।

মনে আছে আমি কোন প্রতিবাদ করিনি, শুধু ময়লা-ধরা বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিলাম, ধর যদি আমি মেয়েদের দর্জি হয়ে যাই, তুমি কি জামা বানাতে এসে আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে ট্রায়াল দেবে?

রূপা চমকে উঠেছিল। সে কি গো, তুমি কি পাগল হলে নাকি? তোমার কাছে আমার কি কোন লজ্জা-শরমের বালাই নেই? তবে, তবে তুমি তো আমার মনটাকে উলঙ্গ

করে নতুন নতুন জামা পরিয়ে দিয়েছ—রামকৃষ্ণ, ডান, তোমা আ কঁপি, আর কি কি যেন ?

এখন লিখতে লিখতে মনে পড়ছে রূপার চলে যাওয়াটা। স্বনির্মাণে। যেভাবেই কোন জ্বলন্ত নারী চলে যায় (কোন কবিতা মনে পড়ল কি ?)' এবং সত্যি, আমার মত এই হতভাগ্যের কোন অনুযোগ তৈরী হ'লো না। আমি আট বছর বয়সে বাবাকে বিনা নোটিশে চলে যেতে দেখেছি। স্ট্রোকে পড়া এবং দেহরক্ষা করা। বাবা মারা গেলে বাবার পাঁচ পাঁচটা গাড়ীর মধ্যে চারটেই একদিনে গ্যারাজ ছেড়ে উধাও হলো। কাকা বলেছিলেন, দাদা নেই, অত গাড়ী রাখবে কে ? আর রেখেই বা কি হবে ?

সন্ধ্যার দিকে গ্যারাজে ঢুকে আমি অবশিষ্ট অস্টিনটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলেছিলুম, তুইও যা, তোদের কারুকে আমার চাই না, আমি হেঁটে হেঁটে মরবখন। কিন্তু গাড়ী তো নিজের মনে গড়িয়ে যেতে পারে না, তাই যথাসময়ে বাবার এক হিতাকাঙ্ক্ষী এসে কাকাকে বললেন, ঘেঁটুবাবু, বড়বাবু নেই। ছেলে-মেয়েরাও ছোট। ও গাড়ী কি হবে। কাজেই, ধ্যান তো শ' পাঁচেক টাকায় বড়বাবুর স্মৃতিটাকে আমার বাড়ীতেই না হয় আশ্রয় দিই। কাকা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, টাকাটা এক হাজার করুন। হিতাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক 'সে-কি হয়, সে-কি-হয়' করে আট শ' টাকা দিলেন। রাত্তিরে খাটে শুয়ে ফুঁপরে ফুঁপরে কাঁদছি, হঠাৎ কাকা এসে ডেকে তুললেন, সাহেব, তোমার গাড়ী তো সব নিয়ে গেল। এবার তুমি আমার পিঠে ঘোড়া-ঘোড়া চাপো। আমি তো আছি, তোমার কষ্ট কি ?

মনে আছে, সে রাত্রিটা পুরো আমি এবং প্রৌঢ় কাকা

ঘোড়া-ঘোড়া খেলে কাটিয়েছিলুম। কাকা ঘোড়া, আমি সওয়ার।

আরও ক'বছর পর আমার ঘোড়াও থ্রম্বসিসে মারা পড়লেন। পরে জেনেছিলুম, আরও অনেকেই আমার আদরের ঘোড়ার ওপর চাবুক চালিয়ে চালিয়ে তার হাল খারাপ করে ফেলেছিল। কাকা মারা গেলেন দুশ্চিন্তায়, যন্ত্রণায়, ভয়ে। যেভাবে আমি অনেক বাঙালীকে মারা যেতে দেখেছি। সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাবা-কাকাদের এই মারা যাওয়া নিয়ে কিন্তু কোন ভাল উপন্যাস লেখা হয়নি। ব্যাচেলর কাকা সকালে পায়খানায় মাথা ঘুরে পড়লেন। বিকেলে মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মোটের ওপর একটা মরাই নয়। কোন অতিনাটকীয়তার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন কাকা। অথচ আমি বছর তিনেক ধরেই কাকাকে মরতে দেখেছি।

স্কুল থেকে হাত ধরে আমায় নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন কাকা। হঠাৎ বললেন, সাহেব, আমি যদি না থাকি, তখন আমাকে মনে পড়বে তোমার? অবাক হয়ে বললুম, তার মানে? তুমি কি কোথাও চলে যাবে? একটু সামলে নিয়ে কাকা বললেন, বুড়ো হয়েছি তো। আর বলতে বলতেই একটা ট্রাম এসে ক্যাঁচ করে কাকার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ড্রাইভার ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, থোড়া রাস্তে দেখ্‌কর চলিয়ে, সাব। কিন্তু কাকা রাস্তা জানতেন, মাঝ রাস্তাও চিনতেন, ট্রামের ভয়ই শুধু ছিল না। পরে জেনেছি, কবি জীবনানন্দের মৃত্যুও ঐ এক ট্রামের চক্করে এবং এখন বুঝি আমাকে একলা ফেলে পালাতে পারেননি বলেই কাকার সে যাত্রায় রক্ষে। অবিবাহিত কাকার আর কী পিছুটান ছিল?

আমি? না আমার সুন্দরী মা? তবে কাকার কিন্তু মেয়েলোকের বাতিক আদৌ ছিল না। বয়সে ছোট আমার মার সামনে কেমন কুঁকড়ে যেতেন। কোন যৌন কমপ্লেক্সে কি? জানি না। আমি কাকার চরিত্রকে প্রশ্ন করি না।

কিন্তু আমি ঐ ঘটনায় জেনে গিয়েছিলাম, কাকা মরতে চান। স্পষ্ট জানলাম, মা ছাড়া আর কেউ আমার পাশে থাকছেন না। মাও বুঝেছিলেন ব্যাপারটা, তাই আমাকে আবডালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর কি খুব একলা-একলা ঠেকে? আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম, ধ্যৎ! কিন্তু মা বুঝলেন কথাটা।

পরের বছরই মা আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করে দিলেন। নরেন্দ্রপুরে। অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর মানুষের মধ্যে সে আমার নিঃসঙ্গ ক'টা বছর।

রূপা গায়ে চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমায় কোথায় প্রথম দেখেছি যেন? আমি বললাম, পূর্বজন্মে। ও আরও সিরিয়াস হয়ে ভাবতে শুরু করলে। হঠাৎ বলল, তুমি কি কখনো নরেন্দ্রপুরে ছিলে? অনেকগুলো শিশুকে মানুষের মাঝে একটা একলা ছেলেকে আমার মনে আছে। আমার ভাই ওখানে পড়ত। ওকে রবিবার রবিবার দেখতে গিয়েই সেই আধপাগলা ছেলেটাকে দেখতাম। খুব ফর্সা, আর বেশ পাগল। আমতা আমতা করে বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমিই বোধ হয় সেই পাগলটা।

সত্যি রূপাই ধরেছিল সেই ব্যাপারটা। একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু পাগল পোষা হয়। নরেন্দ্রপুরে আমি ছিলুম ওরকম একটা পাগল। কাজেই, স্কুল পাশ করার পর ফ্লোরেন্সত্যাগী দান্তের মত বলে আসতে পারিনি, নান্‌কুয়াম

রেভের্তো। কারণ, সেখানে ফেরার নৌকোগুলো পোড়াবার মত সাহস আমার কুলোয়নি। এবং এ সত্যটাও রূপার অজানা ছিল না। ও বলেছিল, একেবারে ঠিক ঐ পাগলামিটা তুমি ফিরে পেলে আমি ফিরে আসব। কিন্তু, এখন বুঝি পাগলামিরও বয়স হয়। নরেন্দ্রপুরে আমি পাগল এবং একা থাকলেও সুখী ছিলাম, এমন কি প্রথম যখন রূপাকে বলেছিলাম, আমি সুইসাইড করতে পারি, তখনও আমি সুখী। আমায় ছেড়ে যাবার সময় রূপা পরিষ্কার জানত, আমি আর কখনও পাগল বা সুখী হব না। ওর যাওয়াটা তাই শেষযাত্রা।

সে বয়সটা কোন মতেই বোরিং ঠেকার কথা ছিল না। আমার স্মৃতিগুলোই বড় বাগড়া দিচ্ছিল। এই যা দু-চার বছরের পিছনের কথা বুকটাকে যেন হাল্কা হতে কিছুতেই দেয় না। তাই রাত্রে লাইট নিবিয়ে রুম-মেট সুমন্ত আর শান্তনুকে বলি, আমরা যে যার মনের চাপা কথা আলোচনা করলে কেমন হয়? আমরা তিনজনই তখন মশারির ভিতর। সুমন্ত আর শান্তনু ওদের প্রেমের কথা শুরু করল। সুমন্ত তুখোড় খেলোয়াড়। ওর প্রেমের গতিও বেশ তুরন্ত। ও বলল, ও এযাবৎ চুমু পর্যন্ত এসে গেছে। খুব শিগ্গির বুকে হাত বোলানোর চেষ্টা করবে। ওদিকে শান্তনুর ভয়ানক সমস্যা মেয়েটির বাড়ীর লোককে নিয়ে। ওরা খুব চেষ্টা করছে ওর বিয়ের। তাহলে শান্তনু মাঠে মারা পড়বে। ওর কথার টোনেই একটা অনুযোগ ধরা দিল। বাকি ছিলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, আমার ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পারবে? মানে, আমার ব্যাপারটাকে কি তোমরা আদৌ একটা ব্যাপার বলবে?

বললাম, আমি একা, ভারি একা। কিন্তু দুঃখী নই। আমার কি ডাক্তার দেখান উচিত? ওরা দুজনেই চুপ করে ছিল। শান্তনুই বলল শেষে, এটা তো কোন বক্তব্য নয়। তুমি লোকের সঙ্গে মিশতে চাও না। সে কথা বলার কি আছে? সুমন্ত বলল, তবু তুমি কেমনতর একা। তুমি কি মেয়ে পাচ্ছ না? বুঝলাম, আমি কিছুই বোঝাতে পারিনি ওদের। ফের বললাম, কতকগুলো ব্যাপার আমাকে বড্ড আঁকড়ে ধরেছে। তোমাদের কি এটা হয়? ওরা দুজনেই স্বীকার করল, ওরা খুব ফ্রী হয়ে চলে বেড়াতে চায়। উইদাউট কনস্ট্রেন্টস। তাই স্কুলের দিনগুলো বড় মন্থর ঠেকে। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়? কি স্বাধীনতা তোমরা চাও? আমরা তো এমনিতেই লুকিয়ে চুরিয়ে কফি করে খাই। সেটা কি···ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। হয়ত ভেবেছিল, আমি খুব ইম্মেচিওর। এবং এই ভাবাটাই স্বাভাবিক। কারণ ও বয়সে স্মৃতি নিয়ে চলাটাও বুঝি এক ধরনের ইম্মেচিওরিটি। যার গোড়ায় আছে বেশ কিছুটা রোম্যান্টিকতা। এখন বুঝি, কাকার ওপর আমার অত্যধিক আসক্তির সূত্রটাও ওখানে। আমার নষ্টস্বপ্নকেও যখন বুঝবার ইচ্ছে জাগত না, তখন একাকিত্বের স্নায়বিক জটিলতা আমায় কুরে খাচ্ছে। এ তো ইডিয়ট তৈরী হওয়ার প্রথম ধাপ। সুমন্তকে বললাম, আমি অনেক কিছুই বুঝি না ঠিক, কিন্তু দুটো একটা ব্যাপারে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। সেগুলিই বলি। যেমন ধরো, একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, বয়স চব্বিশ, নাম জ্যানিস, কি শুনছ তো? বুঝলাম, ওরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কথা কেউ শুনবে না। একটা মশা ঢুকে পড়েছিল মশারিতে।

সেটাকে মারার জন্য উঠে বসলাম।

নরেন্দ্রপুরের মুক্ত আকাশটাই আমার স্মৃতি। সেখানের ঝিলগুলোও আমাকে চেনে। ওখানে দুটো মুরগির আমি নাম দিয়েছিলাম। বিরাট লাইব্রেরীটার ভারিক্কি চালের বই-গুলোতে আমার অপটু হাতের কমেণ্ট আছে—ওয়াণ্ডারফুল! রিয়্যালিস্টিক এ্যাণ্ড সেন্সিব্‌ল; নাথিং টু কমপেয়ার উইথ্‌ ...রূপা এ সমস্ত শুনে বলেছিল, বলিহারি। এক ঘরে চলতি গোছের ছেলেদের সঙ্গে থেকেও এ বুজরুকি আমার বহাল ছিল। ক্রমে ওদের সঙ্গ হারিয়ে, বা তা না যোগাড় করতে পেরে, আমার সেন্স অব হিউমারও ভেস্তে গেল।

নরেন্দ্রপুরে যতই একা হই, ততই যেন একা হওয়ার রেওয়াজ বাড়ে। বন্ধুরা কৌতুক করলে, আমি তার থেকে বাদ পড়ি। শুধু প্রশ্ন করি, আমি কখন হাসব? আর যখন হাসি, তখন কেবল একটা আওয়াজই হয়। মজাটা কোথায়, কে জানে। অন্যদিকে আমার কথাতে কেউ হাসলে আমিই অবাক হই। আমি হাসালুম, না কি ও আমাকে দেখেই হাসলে? বেশ বুঝলাম, আমার স্পীচ্‌ পাল্টে যাচ্ছে। আমি ওদের কেউ নই। আমার ভাষা ওরা বোঝে না। আমার একটা আলতো তোতলামিও শুরু হলো। আর কথার গতি গেল অসম্ভব বেড়ে। লুকিয়ে চুরিয়ে ছোট্ট আয়না ধরে চোখের সামনে আমি স্বগতোক্তি অভ্যাস করতে লাগলাম। পরে রূপা বলেছিল ভারি কষ্টের সঙ্গে, তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলো না। তুমি সলিলকি করো। তুমি কিছুই কমিউনিকেট করতে চাও না এবং পার না। তুমি নিজেতে নিজে মশগুল।

কিন্তু রূপা জানত না, আমি বাজে বকি কেন। আমি

নিজের সময় কাটাতে দুটো মানুষের কথা বলি। বক্তাও আমি, শ্রোতাও আমি। আমার দিনে-রাতের সময়গুলো ঘিরে বেশ কিছু শব্দই আছে। সেখানে মানুষ কম। পরে রূপাই সে শব্দপ্রবাহে ভাঁটা এনেছিল ওর ঠোঁট, ওর জিব, ওর হাত এবং ওর বুক আমায় তুলে দিয়ে। আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। এবং রূপার ঐ শরীরটা আমার কথা বলার দৌরাত্ম্যতেই পাওয়া। ওর বুকে হাত রেখে আমি বলেছিলাম, মিষ্টি। ও লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ওর চোখ দুটো তখন ভীষণ লাল। জানি না, হয়ত মনে মনে হেসেছিল বাচালটা আর কথা কইতে পারছে না দেখে। আমি আবার তদ্গত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বুঝিনি স্পর্শসুখ আমাকে বিভোর করে।

আমি নরেন্দ্রপুরে দুষ্টুমির বশে একটা ইঁদুরকেও চেপে ধরে আদর করতে যাই একদিন। 'মাইস এ্যাণ্ড মেন'-এর ঐ মোটা গবেটটার মতন কোন ইঁদুরপ্রীতি যদিও আমার ছিল না। রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করছিলাম। হঠাৎ ইঁদুরটা লাফিয়ে আমার বইয়ের তাকে পড়ল। ভারি লোভ হল ওকে ধরে চটকে দেওয়ার। রূপাকে একবার এ গল্প বলে ফেলি একদিন। ছিঃ ছিঃ করে উঠেছিল ও। ইঁদুরটাও বিরক্ত হয়ে আমায় নখ দিয়ে ছিলে দিল। তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি আর সুমন্ত সেটাকে ঘটি ঘটি জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিলাম। ও নিশ্চয়ই হাঁচতে হাঁচতে মরে গেছল পরে। 'আইলেস ইন গাজা'-র অ্যান্থনি বিভীসের হোস্টেলের দুষ্টুমির সঙ্গে বেশ মিল পাই কাণ্ডটার। রূপা বলেছিল, বিভীস তোমার মত ইঁদুরটাকে হাঁচিয়ে মারেনি। ও তো কেবল ল্যাজ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। রূপা কিন্তু

আমার দুষ্টুমিটাই পছন্দ করতো বেশি। প্রেসিডেন্সীতেও একটা ইঁদুর ভেজাবার খেয়াল আমাদের চেপেছিল। কিন্তু ওখানে কোন ইদুর ছিল না।

রূপার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঐ দুষ্টুমিটাও বাতিল হয়ে গেল। ঐ দুষ্টুমি আমি রূপাকে সঁপেছিলাম। কলেজসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে তা দেখে আমায় প্লে-বয় ভেবে ফেলল। যে মানুষের কথা কেউ শোনে না বা বোঝে না, যার পারত-পক্ষে একটিই বন্ধু, তার আবার প্লে-বয়ত্ব কোথায়, রূপা বলত। সে যদি দুষ্টু হয়, তো দুষ্টই থাকবে। কিন্তু রূপা দুষ্টুটাকেও পঙ্গু করে গেল। পরে পেয়েছিলাম প্রিয়াকে। কিন্তু ভেতরের দুষ্টুটাকে কিছুতেই তাতিয়ে তুলতে পারলাম না। চুমু খাব বলে ওর বাড়ীতে গিয়ে কবিতা শুনিয়ে চলে এলাম। প্রিয়া কি চাইত বা চায়, আমি জানি না। কিন্তু, ভারি মন খারাপ হয় ভাবলে, ও কেন আমাকে খেপিয়ে তোলে না। অসহ্য বোধ করি ওর ভালমানুষিতা দেখে। দুটো ভাল মানুষ সারাটা জীবনই তো আলাদা আলাদা থেকে যায়। কেউ কাউকে কামড়ায় না। তাই একদিন হন্যে হয়ে চলে গেলাম এক বেশ্যার কাছে। সঙ্গে এক একদা-অতিবিপ্লবী বন্ধু।

॥ ২ ॥

বাবার শ্রাদ্ধ হয়েছিল খুব ঘটা করে। আমি সেখানে পাত পেড়েছিলুম একজন আমন্ত্রিতের মতন। কারণ, ততদিনে আমি জেনে গেছি, বাবা বলে কোন মানুষের ওপর আমার অধিকার নেই। মুখাগ্নির সময় দাদাকে আর আমাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দেয় অন্যেরা! কারণ, বাবা নাকি মাকে সামাজিকভাবে বিয়ে করেননি। আর প্রেমের বিয়ের ঐ পামর আত্মীয়দের কাছে স্বীকৃতি কোথায়? কাকার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভানুদা। বাবাকে খুবই ভালবাসতেন এই গুণ্ডা-আখ্যাত ভদ্রলোকটি। প্রায় হিড়হিড় করে ঐ মাতব্বর আত্মীয়দের তিনি সরিয়ে দিলেন চিতার পাশ থেকে। আর কতকগুলো হিংস্র চোখের দৃষ্টির সামনে দাদা আর আমি বাবার মুখে আগুন ছোঁয়ালাম। অশৌচের ঐ এগারটা দিনই আমি তিল তিল করে নিজেকে তৈরি করলাম ঐ শত্রু মানুষগুলোর কথা বুঝতে। এবং সে প্রশ্নের উত্তর কাকা আমায় দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন পরে। কিন্তু ততদিনে বাবা বলতে আমার কাছে একটা অদ্ভুত আইডিয়া তৈরি হয়ে গেছে। সে আইডিয়াকে আমি এখনও ছুঁতে পারি না।

খেতে বসে গরম লুচি হাতে নিয়েই মনে পড়ে গেল বাবার সঙ্গে দার্জিলিঙের দিন ক'টা! সন্ধ্যে হয়ে আসছে ম্যালের ওপর, আর আমরা একটু একটু করে হেঁটে

চলেছি এভারেস্ট হোটেলের দিকে। বাবা বললেন, সাহেব, তোমাদের স্কুলে কবিতা কি পড়িয়েছে ?

আমি বললাম,

হাম্‌প্টি ডাম্‌প্টি স্যাট অন এ ওয়াল

হাম্‌প্টি ডাম্‌প্টি হ্যাড এ গ্রেট ফল।

অল দ্য কিংস্‌…

বাবা এক রকম মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমি কি কবিতা বলছি শোন। তারপর আমি তোমায় শিখিয়ে দেব'খন। বলেই শুরু করলেন স্বামিজীর "কালী দ্য মাদার" থেকে আওড়াতে।

দ্য স্টারস্‌ আর ব্লটেড আউট,
দ্য ক্লাউড্‌স আর কাভারিং ক্লাউড্‌স।
ইট ইজ ডার্কনেস ভাইব্র্যাণ্ট, সোন্যাণ্ট
ইন দ্য রোরিং হোয়ার্লিং উইণ্ড……

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলুম, ঐ গম্ভীর গলায় স্বাদু শব্দের ঘনঘটা। জানিনা, সেদিন ঐ সান্ধ্যক্ষণে আমার শব্দপ্রীতির সূচনা কিনা। তবে বেশ বুঝি, আমি বাবাকে হিংসে করেছিলাম, যখন দেখেছি মা হাঁ করে শুনছে বাবা কি বলেন। ততদিন পর্যন্ত মা আমার কোন আবদারই ওভাবে মুখ ফাঁক করে শোনেনি। পরে নরেন্দ্রপুরের দিনগুলোতে নতুন শেখা কবিতা শুনিয়ে আমি হামেশাই মাকে এণ্টারটেন করেছি। মা স্নেহ করে বলত, বাঃ, অনেক শিখেছিস তো। মা তখন থোড়াই বুঝত, আমি কোনো কোনো মুহূর্তে বাবা সাজতে চাই।

বাবার অবসরকালে আমি তাঁকে কবিতা শোনাতাম। সব কবিতাই ঐ পন্থ-পন্থ। তখন আমার বিদ্যেই বা কী। অথচ বাবা একজন দূরের মানুষের মত আমাকে সেই অভ্যাসেই টেনে নিতেন, যার মাথামুণ্ড আমি বুঝতাম না। হঠাৎ একদিন কি খেয়ালে বাবা আমাকে বায়রণ মুখস্থ করতে দিলেন —রোল অন, রোল অন, দাও ডার্ক এ্যাণ্ড ডীপ ব্লু ওশান রোল…পরে আমার মুখে লাইনগুলো শুনে বললেন, আমি না বললেও তুমি বই পড়বে। অনেক, অনেক বই পড়বে। আর বড় হলে তোমাকে আমি অক্সফোর্ড পাঠিয়ে দেব। সেদিন আমি জানতাম না অক্সফোর্ড জিনিসটা কি। বাবাও বোধ হয় জানতেন না, এই ছোট্ট আশার কথাটুকু আমার কত বড় বিড়ম্বনা হয়ে উঠবে।

এর কিছুদিন পরই বাবা মারা যান। এবং এই সময়ের মধ্যেই দিদির জন্য বাবার মনোনীত পাত্রটি বিলেত থেকে ফিরে আমাকে জানিয়ে দেয়, অক্সফোর্ড কি বস্তু। সে পাত্র বাবা মারা যেতেই সটকে পড়ে, সোনার হাঁস খুন হয়েছে দেখে। দিদিও এক যাচ্ছেতাই প্রেম-বিবাহ করল এক বছরের মধ্যেই। আমাদের পরিবারে বাবার ট্র্যাডিশন ভাঙতে শুরু করল একে একে। আমি শুধু বাবার একগুচ্ছ বই আর কিছু কথা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে তখন একটা অক্সফোর্ড জ্বলছে দাউ দাউ করে। এক রকম উচ্চণ্ড রাগের সঙ্গে একটা বাংলা মিডিয়ামের মিশনারি স্কুলে পড়া চালাচ্ছি তখন।

আমার অ্যাম্বিশনগুলো ঘায়েল হলো কাকার সঙ্গ পেয়ে। কাকা ভাত-কাপড়ের বাইরে খুব বেশী তাকাতেন না। কোনও দর্শন নিয়েও তিনি চলতেন না। কেবল দমকায়

দমকায় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন। এক রকম নাড়ীর থেকে উঠে-আসা সে কথাগুলো তাঁর। এবং সে কথায় আমি কখনও কোন অভিযোগ দেখিনি। একজন পরাজিত মানুষের সমস্ত অপদার্থতা নিয়েই কাকা ছিলেন সম্পূর্ণ। কাকা যে মরতে চাইতেন তার কারণও কোনও দুঃখ নয়; কাকার কোন চাহিদাই ছিল না। সুইসাইড করাই বুঝি কাকার সাদামাটা জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সেটুকুও না পারায় কাকার চমৎকারিত্বটুকু আমার কাছে রয়েই গেল। ক্রমে মোটের ওপর স্বেচ্ছায় কাকার শেকড়বিহীন, ভুঁইফোড় ট্র্যাডিশনের মধ্যেই আমি ঢুকে পড়লাম।

রূপা বলত, তোমার অ্যাম্বিশন থাকলে তুমি একটা দেখবার মতন গাধা তৈরী হতে। হৃষ্টপুষ্ট, সভ্য-ভদ্র গাধা। প্রিয়াও তাই মনে করে, হয়ত বা আরও বেশি, কারণ বোকার মতন চটকের সন্ধান করে বেচারী প্রায় নাজেহাল। ওর ধারণা, একটা উদ্ভ্রান্ত মানুষের থেকে ফ্যাশনেবল কিছু দুনিয়ায় নেই। ওর প্রথম ভালবাসার ছেলেটিকে আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের মধ্যে ও দেখতে চায় না। সে ছেলেটিকে আমি দু-একবারই দেখেছি। দেখে ভয় পেয়ে যেতুম, যেমনভাবে কাকাকে দেখেছি বাবার গণ্যমান্য বন্ধুদের মহল থেকে সরে পড়তে। তাঁরা ঘরে ঢুকলেই কাকা ঢোক গিলতেন। বাবাকে ডেকে দিয়েই খালাস হতেন। প্রিয়ার সেই আগের বন্ধুর কথা মনে পড়লেই আমি বেসামাল হয়ে যাই ওর সামনে। তোতলামি এসে যায়, কথা জড়িয়ে যায়, সর্বোপরি আনসান বকতে শুরু করি। আমার শব্দের প্রতিষ্ঠা সেখানে আমাকে বাঁচাতে পারে না। মেয়েদের

ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কাকাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি, বেশ্যারাই ছোটখাটো মানুষের বিশ্বাস যোগায়।

বন্ধু সৌগতও থেকে থেকে বলত, একবার ওখানে গিয়ে মেয়েছেলের কমপ্লেক্স কাটাই চল। কিন্তু ওদিকে আমার কোন আগ্রহই কখনও গজাল না। মনে হতো, বেশ্যারা আমাকে করুণা করবে, গালে নওছ্য়া করে টোকা দিয়ে দেবে। এবং শরৎচন্দ্রের নভেলঘেঁষা কোন বারবণিতা আদৌ থাকলে, সে বাড়ীতে এসে মার কাছে নালিশ করে দেবে। অথবা হেলিহীর চরিত্র জোয়ানিতা কেউ থাকলে তো আর কথাই নেই। দেশ বিভাগের করুণ ইতিহাস গড় গড় করে বলে যাবে সামনে বসে।

সুনীতা কিন্তু সে সমস্ত কিছুই করল না। সৌগত ওর ভাগের মেয়েটিকে নিয়ে অন্য একটা ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কাপড়-চোপড় খুলতে শুরু করল। রাগে, ঘৃণায় আমার গা দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে। সৌগতের মুণ্ডুপাত করে চলেছি মনে মনে। সুনীতাই বলল, কৈ হে, তুমি মুখ গোমড়া করে বসে কেন? বউকে মনে পড়ল বুঝি! বললাম, হ্যাঁ। একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের বললাম, তুমি কাপড়গুলো পরে ফেল। আমি কিছু চাইতে আসিনি। ঝট করে খেপে উঠল মেয়েটা, তবে টাকা দিল কেন তোমার বন্ধু? তুমি কি তোমার মতন ফর্সা মেয়ে চাও? তাহলে যাওনা পাশের ঐ গলিটাতে অ্যাংলোগুলোর কাছে। সাদা চামড়া আর রোগের ডিব্বা। আমি হাতের বইটা খুলে ওর থেকে চোখ সরাবার বন্দোবস্ত করছিলাম। ও সাঁ করে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। এবার আমার খেপার পালা। তোল্ শিগগির, এক্ষুণি তোল্, বলে তুই-তোকাড়ি শুরু করলাম।

মেয়েটা ঘরের বউ-এর মতন সলজ্জ ভঙ্গীতে বইটা তুলে দিয়েছিল। কোন রোমাঞ্চ নেই, শিহরণ নেই, এতটুকু ভাবালুতা নেই—এই রকম এক প্রশান্তি নিয়ে আমি ঘরের কড়িকাঠ গুণলাম আধ ঘণ্টা ধরে। মেয়েটা শরীরের ওপরের অংশ নগ্ন করে সমানে আমায় দেখে গেল। শুধু যাবার সময় আস্তে করে বলল, তুমি কেমন ধরনের খদ্দের হে? বউ নিয়ে পড়ে থাক, যাও।

কাকার মুখেই শুনেছি, রাস্তায় দালাল পাকড়েছিল বলে বেচারী কাকা তিনদিন বাবার সামনে যেতে পারেনি। আমি এর পর থেকে প্রিয়ার ওপর ভয়ঙ্কর চটে গেসলাম। ও অন্য কোন ছেলে ধরলেও আমার এতটা দুঃখ হতো না মনে হয়। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ, কি টেলিফোন বন্ধ করে দিলাম। দুঃখ এই, বেটী এ সমস্ত কিছুই জানল না।

॥ ৩ ॥

মিশনে আমি শুভদার গান শুনতুম বিলকুল হাঁ করে। কোন সমালোচনা নেই, খুঁটিয়ে দেখার কোন প্রস্তুতিও নেই, শুধু আবেগ। শুভদা অন্ধ ছিলেন, আর গান গাইতেন ওপরের দিকে তাকিয়ে, যেন কিছু খুঁজছেন। শুভদারই এক দোস্তের কাছে মাঝে মাঝে গান শিখতে যেতুম আমি। অথচ, অসহায় দৃষ্টিতে শুভদার গান গাওয়াটাই আমাকে টেনে নিত অন্যদিকে। শুভদার মতন আমারও একটা শূন্যতার মধ্যে গান গাইবার ইচ্ছে হতো। কিন্তু যেহেতু আমি ভাল গাইতে পারতাম না (রাগের সুর আমায় এত বিচলিত করত যে গলা আপনিই স্তব্ধ হয়ে যেত) এবং যেহেতু শুভদার মত আমি অন্ধ ছিলাম না, আমার কোন অন্ধকার, আলো, আকাশ বা সমুদ্র ফুটত না চেতনায়। অবশেষে আমি আমার ডান চোখটা চেপে ধরে নিবু-নিবু বাঁ চোখের আলো-আঁধারিতে ভাব খুঁজতে শুরু করলাম। ঐ ছোঁয়া-ছোঁয়া অন্ধকারে আলোর রূপটাই মিষ্টি করে ফুটে উঠল। আমি গাইতে লাগলাম শুভদার মনের মতন গানটি। আমার খারাপ গাওয়ার মধ্যেও ব্যঞ্জনাগুলো মার খেল না। বহু পরে সেতারী বন্ধু বাপী বলেছিল, সে গান চাঁদনী কেদারে বাঁধা। আমি কিন্তু সেই অজ্ঞানের বয়সেও জানতুম, গানটা কোন আলোর সমীক্ষা, কোন অন্ধকারের পরিচিতি, কিংবা উভয়ের মিলনে স্তব্ধ কোন রেম্ব্রাণ্টের ছবি।

শুভদা কখনো কখনো গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। বড় দরদ ছিল মানুষটার, যদিও এমনিতে ওঁর মেজাজটা বেশ রুক্ষ। উনি গাইতেন, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। আমি ওঁর নিবেদনে একজন অন্ধ মানুষের অভিযোগ শুনতে পেতুম। দেখেছিলাম, অন্ধ মানুষেরা আত্মার দিকে বেশ বলিষ্ঠ। তাই মাকে পরে একদিন বলেছিলাম, মা, তুমি আমার বাঁ চোখটা সারিয়ে তুলো না। আমি কষ্ট করে অন্যটা দিয়েই চালিয়ে নেব'খন। বরং শেষ বয়সে একদম কানা হয়ে গেলে, নিজের মনের রূপসাগরে ডুবে যাব বেশ। মা আমার মুখ চাপা দিয়ে ভীষণ ধমকে দিয়েছিলেন। মা জানতেন, আমার মতন অসহায় মানুষের আর বেশী বিড়ম্বনা কিছু থাকতে পারে না। রূপাও একদিন আমার চশমা লুকিয়ে বলেছিল, তুমি দেখতে পাও বলেইতো অন্য মেয়ে খোঁজ। তোমার উচিত চোখ বন্ধ করে শুধু নিজের মনটাই দেখা। দেখবে কত স্বার্থপর তুমি।

আর একদিন কলেজ থেকে সিনেমায় যাব। রূপা বলল, ওর ঠোঁটের লিপস্টিকটা ফের ঘষে নেওয়া দরকার। আশে-পাশে আয়না বা কাঁচ কিছুই ছিল না। ও বলল, তোমার পাওয়ারের কাঁচটাতে আমি কাজ সেরে নিই। রূপা আমার চশমার কাঁচে মুখ দেখছিল। আমি ডান চোখ আঙুলে চেপে রেখে বাঁ চোখে ওকেই শুধু দেখছিলুম। অন্ধকারের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমি স্পষ্টই দেখলাম, আমার সামনে কোন মানুষ নেই, কোন নারী নেই, কোন রূপা নেই, এবং কোন রূপের কোন কিছুই নেই। ভারি ভয় হলো। ভাবলাম, যদি সত্যিই কোনদিন রূপার সঙ্গে প্রেম করতে করতে দেখি রূপা নেই। আমি আমাকে

আলিঙ্গন করেই বসে আছি। রাস্তায় নেমে রূপাকে কথাটা বলেছিলাম। ও বলেছিল, তুমি যদি সত্যি পারতে, নিজেকে ভালবাসছ ভেবে আমাকে ভালবাসতে, তাহলে আমার কোন দুঃখই ছিল না। তুমি তো পাপ করছ ভেবে আমাকে চুমু খাও। তুমি আমাকে স্বভাবের বশে স্পর্শ কর। তোমার আসল অভাব শুধু তুমিই।

তার আগে আমি 'হ্যামলেট' বহুবার পড়েছি। কিন্তু সেদিন ওরিয়েণ্টে কোজিন্তশেভের 'হ্যামলেট' দেখতে দেখতে বার বার মনে হয়েছে, একে তো আমি চিনি। এ রকম আর্ত একটা মানুষকে আমি মনে মনে প্রশ্রয় দিয়েছি। রূপা আমার পাশে বসে রুদ্ধশ্বাসে সব দেখে গেল। হ্যামলেটের পাশে পাশেই আর একটা মানুষের অধঃপতন ওর চোখের সামনে ভাসছিল। হ্যামলেটের মতন তার কোন শৌর্য-বীর্য, প্রতিপত্তি নেই। ওদের যোগসূত্র শুধু অসহায়তায়। একটা দ্ব্যর্থক মন্তব্য রাখল রূপা হলের বাইরে এসে, এ সমস্ত মানুষের জন্য বড় মায়া হয়। অথচ এদের বাঁচান যায় না। বিদূষী রূপার এই ছেঁদো মন্তব্য যে মোটেই হ্যামলেটকে নিয়ে নয়, সেকথা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছিলুম। রূপার এই ক্ষমাহীন স্নেহকে ঝেড়ে ফেলার জন্য আমি তার পরের দিনই পর্ণার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ি।

অহঙ্কারই তোমায় ডুবিয়ে মারবে, রূপা বলেছিল একবার। আমার ঠোঁটের থেকে ওর ঠোঁট ছিল চার ইঞ্চি দূরে তখন। রাগে কাঁপছিল ওর সমস্ত শরীর। ক্লাসের পর্ণাকে ও সহ্য করতে পারে না। পর্ণা সুন্দরী। বিবাহিতা, তবে ওর স্বামী কাজ করেন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্যালিফোর্ণিয়ায়। এবং পর্ণা আমায় ভয়ঙ্কর ভালবাসে। ও আমার পাশে

থাকলে আমরা লোকের চোখে না পড়ে পারি না, কারণ পর্ণা নিকষ কালো। আমি আদর করে ডাকতাম, ডার্ক লেডী বলে। রূপা বলল, পর্ণাই তোমার কাল হবে। তুমি কারোকে সুখী করতে চাও না। তোমার ইচ্ছে সবাই তোমার মতন জ্বলে পুড়ে মরুক নিজের নিজের কল্পিত দুঃখে। আর এও জেনো, তোমার একমাত্র দুঃখ এখন আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায়। তোমার একা থাকার সুখটাই তুমি বেশী পছন্দ কর। অন্য একদিন পর্ণা বলেছিল, রূপার ইচ্ছে তোমার মায়ের পদটা নেয়। তোমার ধরনের ঈডিপাস কমপ্লেক্স কারো চোখে না পড়ে পারে না। আর তাছাড়া রূপা তো মনে মনে একটা রাবীন্দ্রিক মহিলা। ও শিগ্‌গির তোমার মা হয়ে পড়বে। ওকে না ছাড়লে তোমার মুক্তি নেই।

রূপার ভালবাসার দস্যিপনা থেকে পর্ণাকেই মুক্তির পথ করেছিলাম কিছুদিন। পর্ণার সঙ্গে ঘোরার কোন রিস্ক ছিল না। আর এই অবাধ স্বাধীনতাটাই পর্ণার মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রূপার সামনে। রূপা কোনদিনই এর মোকাবিলা করতে পারত না। নিজের রোষে নিজেই পুড়ে মরত রূপা। ফলতঃ আমার ওপর দাবি ওর বেড়েই গেল ক্রমশ। তাই একদিন একান্তভাবে পরাজিত এক সাধারণ মেয়ের মতই কবুল করেছিল, লক্ষ্মীটি ওর সঙ্গ তুমি ছেড়ে দাও। আমি পারি না ও যা পারে। কিন্তু আমি তোমায় ভীষণভাবে চাই। ও চায় না। তুমি আমাকে চাও না-চাও, তুমি অন্ততঃ ওর সঙ্গে ঘুরো না। আমার ইজ্জতে লাগে। মনে আছে, রূপার সে স্বীকারোক্তি আমাকে প্রথম বেঁচে থাকার মজা দিয়েছিল। ভেবেছিলুম, যাকগে, একটা একা মানুষও তার সিচ্যুয়েশন তৈরী করে নিতে পারে। আমার নিজের

ওপর আসক্তি বেড়ে গেল। বাড়ি ফিরে নিজের পুরনো ফটোগ্রাফগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম বহুক্ষণ।

এই সঙ্গে একজন গর্বিত মানুষের মত আমার গোপন ভয়গুলোও মনের সমস্ত কোঠাগুলোতেই ছড়িয়ে পড়ল। পর্ণা আমার প্রয়োজনীয় অস্ত্র, এই বোধটা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগল। পর্ণাকে এক আহ্লাদের মুহূর্তে বলেওছিলাম কফি হাউসে, পর্ণা, টু মি ইউ আর এক্সট্রিমলী ইনডিস্পেন্সিবল। ও শুধু মাথা নেড়ে সায়ই দেয়নি, খোঁচাটাও দিয়েছিল, উই হ্যাভ টু মিঙ্গল আওয়ার লোনলিনেসেজ ফর মিউচ্যুয়াল বেনিফিট। সত্যি, পর্ণার মতন ও-রকম নিঃসঙ্গ মানুষ আমি কমই দেখেছি। অত গ্ল্যামারাস কোন মেয়ে যে অত অল্প কথা বলে, কিংবা আমার মতন বাচালকে সহ্য করে, এ আমার ধারণা ছিল না। পর্ণাই সময় সময় আকারে ইঙ্গিতে আমায় বুঝিয়েছিল, আমাদের মেলা-মেশাটার প্রয়োজনটা কোথায়। দুটো নিঃসঙ্গ লোক তাদের নিঃসঙ্গতা বাঁচিয়ে রাখতেই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। উভয়ের আশে-পাশে যদিও লোকের অভাব নেই, তবুও একের উপজীব্য শব্দ, অন্যের নৈঃশব্দ। এবং পর্ণার নৈঃশব্দ অনুশীলন করা কিছু নয়। একেবারে শরীরের ব্যাপার। অথচ যে শরীরের যৌবন চাঞ্চল্যের ব্যঞ্জনার সঙ্গে তার কোন যোগই নেই।

এই চ্যালেঞ্জটা হঠাৎ মারা পড়ল, পর্ণার কলকাতা ত্যাগের মুহূর্ত থেকে। একটা মোটা খাম নিয়ে এসে একদিন দেখাল পর্ণা। ওর বিদেশযাত্রা ঠিকঠাক। ও আর ক'দিনের মধ্যেই চলে যাবে। আর জানে না ফিরবে কবে। এ খবর পেয়ে আমার আনন্দ মন ছাপিয়ে শরীরে গিয়ে ঠেকেছিল। ভয়ঙ্কর আহ্লাদে ও পর্ণার জন্য মুহুর্মুহু চোখে জল আনতে লাগল।

বেচারী পর্ণাও ঘাবড়ে গিয়েছিল তাতে। আমি কিন্তু জানতাম, রূপা ভাল অভিনয় করতে পারে। আর এ সময়টা ওর জীবনের সেই পর্যায়, যখন আত্মসম্মান ফিরে পেতেও মানুষকে অনেক বেসামাল, অক্‌ওয়ার্ড কাজ করে ফেলতে হয়। আসল কান্নাটা কেঁদেছিলুম আমিই, পর্ণা যেদিন প্লেন ধরল। ওর প্রস্থানের থেকেও আহত করেছিল আমাকে রূপার ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাস। সহসা যেন একটা গুপ্তমন্ত্র ভুলতে বসলাম। কর্ণের রথচক্রের মতন আমার সৌভাগ্যের চাকাও তখন মাটিতে জামঠাসা হয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

॥ ৪ ॥

বাবার দুঃখটাও বুঝি। আমার কাছে তিনি আইডিয়া। ওঁর সমসাময়িকদের কাছে ব্যাখ্যার অতীত এক সজ্জন ব্যক্তি, যাঁর ক্ষতি করে নিজেদের দাঁড় করান নীতিবর্হিভূত নয়। বাবার ট্র্যাজেডী ছিল তাঁর সমস্ত উদারতা, পাণ্ডিত্য এবং দর্শন দিয়ে সাধারণ মানুষের তৈজসপত্র হয়ে পড়া। তিনি মানুষের বেশ কাজে লাগতেন। ক্রমে এক ব্যক্তিবিশেষ থেকে তিনি উপকারী জীব হয়ে দাঁড়ালেন।

বাবা লোকসভার ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিলেন। এবং গুণধর মোসায়েবদের গুণে হেরেওছিলেন। প্রচুর টাকা লণ্ডভণ্ড করে যখন দেখলেন সমস্ত কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন নিজের গলায় গামছা লটকে আত্মহত্যা করতে যান। তাঁর দুঃখ পয়সাকড়ির জন্য নয়। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা। শুধুই বলেছিলেন সেই ট্রাজিক ক্ষণটিতে কাকাকে উদ্দেশ করে, ঘেঁটু, এরা সব আমাকে হারিয়ে দিলে। এরা আমাকে হারিয়ে দিলে। সদাপরাস্ত কাকাই বলতে পেরেছিলেন সেই দিনটিতে, দাদা, তুমি এ সমস্ত ভুলে যাও। তোমার নিজের কাজ শুরু কর। তোমার এ বয়সে ঠকবার পালা শেষ কর।

বাবা সেদিন থেকেই একটা বই লেখা মনস্থ করেছিলেন। জানিনা কি বই তিনি শেষ অবধি লিখতেন। তবে সে বয়সে তিনি ডুবে গিয়েছিলেন কালিদাস, পাস্কাল, বের্গসঁ, কাণ্টে।

একজন দুর্দান্ত আইনজীবীর পক্ষে এ পথে চলে আসা জীবন-বরবাদী নয়। বাবার চরিত্রে কোন টাইমনের স্থান ছিল না। থাকতে পারে না। অন্ততঃ কাণ্টের 'ক্রিটিক অফ রিজন' বইয়ে বাবার পেন্সিল দাগান দেখে তা মনেই হতে পারে না। আর তাছাড়া, ঐ দুর্যোগের পরেও বাবা বাড়িতে দু'শ গরীব ছাত্রের খাওয়ার পাট উঠিয়ে দেননি। কেবল পরিবারমুখো হয়ে পড়েছিলেন। আমি রাত্রে বিছানায় পেচ্ছাপ করি জেনেও আমায় নিয়ে শুতে লাগলেন। আমাকে নিয়ে তিনি আবার ছাত্র হতে চাইছিলেন। আমি 'রবিনসন ক্রুসো' পড়ছি, বাবা পড়ছেন শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ, নীৎশে। এবং ঠিক এই রকম এক সখ্যতার পর্যায়েই তিনি চলে গেলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, মরণের প্রস্তুতিতেই লোকেরা আমাকে ভালবাসতে শুরু করে। রূপা যখন বলল, ও সুইসাইড করতে যাচ্ছে, তখন এই তত্ত্বটাই আমাকে চেপে বসেছিল। ওর কথার কঠিন দিকটা মনে করেই বলেছিলাম পরে, ছিঃ! ও কথা বলতে নেই। তুমি ভাল বিয়ে করতে চলেছ। তোমার নতুন সংসার হবে। তুমি কেন মরার কথা বল? আমার মত হবু-কেরানীর জন্য কারো মরা উচিত নয়। তখন বেশ আঁচ করতে পারছিলাম, আমি ধীরে ধীরে একটা কেরানী হতে চলেছি, যেভাবে বনের নেকড়েও এক সময়ে খাদ্যাভাবে শহুরে মানুষের কুকুর হতে বাসনা করে। শুধু রূপাই বলেছিল, তোমার মতন কেরানী নিয়ে যে-কোন কোম্পানী ডকে উঠবে। তোমার উচিত গ্রামে গিয়ে গোলাপ চাষ করা। আর একটা তোতা পাখীকে রিল্কের কবিতা পড়ান।

আমি সেই কথা মনে করে পাখী পুষব ঠিক করেছিলাম,

একটা পাখী কিনেওছিলাম। সেটা বাঁচল না তখন নিজের মনেই কবিতার মাস্টারি শুরু করলাম। যেখানে সেখানে বসে বসে পছন্দসই কবিদের কবিতা আওড়াতে লাগলুম। সেটা ক্রমশই বেড়ে চলল। শেষে সে-পাট চুকে গেল, যখন নিজেই কবিতা ফাঁদতে আরম্ভ করি। শব্দের ওপর ও-রকম বলাৎকার আর বুঝি কেউ করেনি। ইংরেজী, বাংলা সব কবিতাই লিখলাম। আর সমস্ত কিছুর মূলে ঐ রূপা। ওকে নিয়ে কবিতা! ওকে ছাপিয়ে কবিতা। ওকে সিঁড়ি করে আমার বেয়াত্রিচে, শকুন্তলার অনুসন্ধান। শেষ অবধি ওকে নিয়েই কালী-সাধনা এবং মাতৃতপস্যা। কবিতা ততদিনে গৌণ হয়ে উঠেছে। কবিতাকে ঘিরে শুধু উইশফুল থিংকিং। দেখলাম, আমি আমার কৈশোরের কালীপ্রেমে ফিরে চলেছি। শরীরে ভয়ানক উত্তাপ বেড়ে গেল। জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে ফাঁক-ফিকিরে মদ খেতে লাগলাম। একবার গ্রীষ্মের তাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে এম-এ পরীক্ষার টেনশন কাটাতে শান্তিনিকেতন চলে গেলাম। ওখানে ক'টি মেয়ের সঙ্গে আমরা তিন বন্ধু গাঁজা টানলুম! সঙ্গে বাংলা মদ ছিল।

পায়ের পাশে কোপাইয়ের জল ছিল। গোয়ালপাড়ার তাড়ি ছিল। মাথার ওপর নীল আকাশ আর আগুনে রোদ ছিল। আর আমার দেহটা তখন গলে গলে জল হচ্ছে। ঘামে ট্রাউজার ভিজে একাকার। হাতের তালুর ঘামের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার কবিতা লেখার প্রবৃত্তিও দেহ থেকে খসে যাচ্ছে। একটা দারুণ ঔদ্ধত্য নিয়ে সমস্ত কবিতাচর্চাকে জলাঞ্জলি দেব ঠিক করলাম। শান্তিনিকেতনের ঠেকে ফিরে এসে কবিতার উপর ব্যভিচার করলাম একটা ছড়া লিখে।

অশ্লীল বলেও সেটাকে বোঝান যায় না।

খুব শিগ্‌গির বন্ধুদের মুখে চরে বেড়াতে শুরু করল লাইন ক'টি। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে যেত অন্যের মুখে ছড়াটা শুনে। একজন আবার নাটক লিখে ফেলল, 'মুহ্যমান ব্যাঙ' বলে, ওর থেকে শব্দ ধরে নিয়ে। অপর একজন আমাকে না জানিয়ে ঐ ছড়াটা টিট্‌কিরির ছলে পাঠিয়ে দিল এক মহিলাকে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম, যখন শিক্ষিত, ভদ্র মেয়েরা এর-ওর মুখে ছড়াটার সম্বন্ধে জেনে অনুরোধ করতে শুরু করল সেটা আবৃত্তি করে শোনাতে। জানলাম, আমি রাস্কেল সাজতে পারলেই মেয়েরা খুশী হয় বেশী। সন্দেহ জাগল, আমি কি তাহলে একটা রাস্কেলের ইম্প্রেশন দিই বন্ধুমহলে, মেয়েদের কাছে? প্রায় সমস্ত সংস্কারগুলো যখন ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে আমার জগতের মানুষগুলোর দোহাইয়ে, তখন একটা নতুন দরজা খুলল এক রাত্তিরের অভিজ্ঞতায়। সে রাত্রি কেটেছিল জলসায়। সেখানে গান গেয়েছিলেন আমীর খাঁ।

আমীর খাঁকে আমি আগেও শুনেছিলাম। কিন্তু সে রাত্রের সেই বিলম্বিত খেয়াল আমাকে একটা ধ্বংসের সামনে থেকে হাত ধরে বার করে নিয়ে এল। পরে জলসার মানুষ-গুলোর ছোট ছোট চরিত্র এবং প্রবৃত্তিগুলো বড় কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও গোটা কয়েক মানুষ সেখানে পেলাম, যারা আমারই মতন পাগল, নিঃসঙ্গ, বিধ্বস্ত। ওরা ভালবাসতে জানে। এমনকি, আমার মতন অসামাজিক মানুষটাকেও। শুভদার কথা মনে পড়ল। অন্ধ শুভদা। দেখলাম, এই মানুষগুলোও অন্ধ। স্নেহে, বিশ্বাসে, পাগলামিতে। আমি শ্লীল হবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রিয়া জানত আদত ব্যাপারটা। গান আমার একটা রিফিউজ। কথার শব্দের থেকে সুরের ধ্বনিতে। ওটাও একটা একলা হবার পথ, নিজেকে গোপন রাখার মতলব। প্রিয়া এল এই সময় ঘুরে ফিরে জীবনে। আমাদের ভদ্রতার বেড়া ডিঙিয়ে যখন কিছুই এদিকে আসে না বা ওদিকে যায় না, তখন কিছু সুশ্রাব্য সুরই ভরিয়ে তুলুক সে ব্যবধানটুকু। দেখলাম, আমাদের আলাপ গিয়ে দাঁড়িয়েছে দৃষ্টিবিনিময়ে আর হাসিতে। সব গানই সেখানে আবহ-সংগীত।

আমজাদ ঝিঁঝিঁট বাজাচ্ছিল কলামন্দিরে। ঝিঁঝিঁটের সুর ঝর্ণার জলের মতন আমার শরীর বেয়ে নামল প্রিয়ার হাতের মৃদু স্পর্শে। প্রিয়া বুঝেছিল কিনা জানি না। কিন্তু ও গলে গলে আমার শরীরে, মনে জমা পড়েছিল। ওর ওপর আকর্ষণ আমার বেড়েই চলল, বলা যেতে পারে একদম শারীরিকভাবেই। অথচ কথা আমার ক্রমেই পাথর হতে শুরু করল। কোন কথাই ওকে বলবার মতন ধৈর্য পেলাম না। কোন কথা বলেও যেন সোয়াস্তি নেই। আমি তোমায় ভালবাসি, কিংবা আরও হাল্কাভাবে, আই লাভ ইউ, বলে নিষ্কৃতি আমি পেলাম না। মনে মনে এক রকম আড়িই করে ফেললাম ওর সঙ্গে। কারণ আমি তখন জানি, আমার শব্দের ব্যবহার প্রতীকী হয়ে গেছে। সহজ কথা বলার মনের জোর আমার নেই। এবং লক্ষ্মীছাড়া এই দেশে আর রবীন্দ্রনাথ বলে প্রেম করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে গান হয়ে গেছেন, কলা হয়ে গেছেন, কবিতা, গদ্য, মনীষী, তৈজসপত্র হয়ে গেছেন। শুধু আমার মতন ভাষাহীন মানুষের ভাষা আর নেই। আমার অফুরান শব্দের মতন রবীন্দ্রনাথও আমার মুখে ধ্বনিতত্ত্ব হয়ে গেলেন। আর প্রিয়াও জানল না, আমি কি চাই

আমারও রাগ হলো, শুধু বলতে পারি না বলে কি আমিও কিছু চাই না। মনে পড়ল কাকাকে। বলেছিলেন, সাহেব, কোন কিছু চেয়ে ফেলার মতন দারিদ্র্য কখনও দেখাবে না। তার থেকে বঞ্চিত হওয়াও শ্রেয়।

॥ ৫ ॥

যে সমস্ত দৃশ্য আমায় মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলে, সে সবই চোখের ওপর ঘটল ইউনিভার্সিটিতে। দিনে-দুপুরে বোমা, গুলি, রক্ত, খুন, ছোরা। বন্ধুদের চোখে দেখেছি ভয়, আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা। এদিকে ইউনিভার্সিটির মতন অপগণ্ড ক্লাসও দুনিয়ায় নেই। সেখানে অধিকাংশ মাস্টাররাই কি পড়ান তার ঠিকানা নেই। তারই মধ্যে জ্যোতিবাবুর 'লীয়ার' পড়ানো শুনতে ছুটি। সন্ধ্যের দিকে প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস নেন তারক সেন। তাঁর সামনে বসে একটু সাশ্রয়। অথচ কামাই আমি করি না। এক অমোঘ আকর্ষণে রোজ রোজ ছুটে যাই কলেজে। সেখানে রূপাকে দেখেও যেন শান্তি। ওর ব্যাপারটাও বুঝি না। এই অসহ্য ক্লাসগুলো করতে ওরই বা আসার কি দরকার। শেষকালে একদিন খুলেই বলল, এরকম প্রশস্ত আড্ডা মারার জায়গা কোথায় পাবে?

কিন্তু এখনও হলপ্ করে বলতে পারি ঐ ইউনিভার্সিটির ক'টা বছর আমি ঝেড়ে ফেলতে পারব না। ওটা আমার স্মৃতিই শুধু নয়, আমার খাঁটি অহঙ্কারের ক'টা দিন। রাস্তায় বোমা পড়তে দেখেও রূপাকে আগলে বসে থাকতাম, ক্লাসে কি কফি হাউসে। ওরও কোন ভয় ছিল না। বাড়ি যাবে না তো যাবেই না। কেবল ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। সংগ্রামী বন্ধুদের এক টুকরো

হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকতাম যার যেখানে স্থান। ঈর্ষে হতো মরণপণ করা ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখে। কিন্তু ক্ষমতা বা তেজ ছিল না ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আমার বিদ্রোহ তখন কেবল স্বপ্নে স্বপ্নে, অপদার্থ মানুষের মতন। আসলে রূপার সঙ্গে প্রেম করতেই আমি বেশী ভালবাসতুম।

রূপাই শেষে একদিন ঘাবড়ে গেল আমার মুখে নতুন তোলা ক'টা শ্লোগানী কথা শুনে। ভারি বাজে বকছ তুমি, ও বলেছিল। অতই যদি গুমোর থাকে তো আমাকে ছাড়ান্ দাও। আর গিয়ে পুলিশের সামনে দাঁড়াও। তাও তো মনে হয় ওরা তোমায় দেখে হাসবে। শখের বিপ্লবীদের হাতে ওরা একটা করে লাল বই ধরিয়ে দেয়। এত কথা শুনেও কিন্তু আমি সেদিন দমিনি। বরং এমন সমস্ত বৈপ্লবিক বকবকানি শুরু করেছিলাম যে ও একবার ঠোঁটে ছোঁয়ানো কফি ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। তারপর তিন-তিন দিন কথা বন্ধ। এবং পরে আপস করল ও নিজেই আর পাঁচবারের মতন। তবে এবার একটু শিগ্‌গির, পাছে আমি সত্যিই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে অভিযান শুরু করি। আর ও তো জানত না, ঐ তিন তিনটে দিন আমি কেবলই তোমা আ কঁপি পড়ে কাটিয়েছি। কঁপির খ্রীষ্টানুকরণের কথায় মানুষের চরিত্রের কথা ফিরে এসেছে বারবার। মানুষের সেই চরিত্র যা অন্যের আঘাতে, প্রশংসায়, বঞ্চনায় এতটুকু চিড় খায় না। রূপাকে সে কথা বললাম। ও বলেছিল, তোমার চরিত্র সে নিক্তিতে দেখলে একজন অস্থির মানুষের। এক ভালবাসা ছাড়া যে চরিত্র নিজেকেই দহন করে, ক্ষত-বিক্ষত করে। তোমার সাজেনা একলা থেকে জর্জরিত হওয়া। আমার

কাছে নিজেকে উৎসর্গ করো, যদি বাঁচতে চাও। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, এই রূপাই একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আমার সঙ্গে থাকার কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে। মনে হয় ওরও কোন বিকার শুরু হয়েছিল ততদিনে। আমারও কেন জানিনা ভয় হতো সে সময় ওকে দেখে। যেন আমার শরীর আর মনের বিষ শুষে নিয়ে ও নীলকণ্ঠী হয়ে উঠছে। ও না ছাড়লে সম্ভবত আমিই ওকে ছেড়ে চলে যেতুম। রূপাকে মরতে দেখার মতন অমানুষ আমি কখনই ছিলাম না।

॥ ৬ ॥

আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে। এই ধরনের চিন্তা-আসর মুলতুবি করার মতন মানসিক স্থৈর্য আমার আসে না কেন? আমি কি জড়িয়ে পড়ছি, এই স্বার্থপর সাব্যস্ত লোকটি? আমাকে চুপ করতেই বা বলেছে কে? (এ্যাই চুপ!) আহা চুপ কেন, কোর্ট কি চালু হয়েছে?

সাইলেন্স প্লীজ। ইয়োর অনার, আমি এই, এই, এই, এই, এই মানুষগুলির জন্য আদরণীয় হয়ে উঠেছি নিজের কাছে। আমার ওপর এই অত্যাচার কেন? ঐ রূপা, ঐ বাবা, ঐ কাকা, দাদা, মা। আচ্ছা, মাকে না হয় বাদ দিলুম। সেক্ষেত্রে প্রিয়াকে ইনক্লুড করি, কেমন? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ইয়োর অনার। এরা আমাকে আমার নিজের কাছেই দুষ্প্রাপ্য করে তুলেছে। আর এই চড়া দরের বাজারে আমি কোথায় তাকে কিনি বলুন তো। আমার কোন চাকরিও নেই। ওঁরা কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তিতেই আছেন এখনও পর্যন্ত। অন্তত তাই আমার ধারণা।

ইয়োর অনার, আমি রূপার সঙ্গে একটু প্রাইভেটে কথা বলতে পারি কি? পারি না? তাহলে ওপেন কোর্টেই বলে ফেলি, নাকি?

রূপা তুমি কি চেয়েছিলে, বলতো? তুমি কি এযাবৎ আমার কাকার সংস্পর্শে এসেছ? দেখ, উনি খেতে ভাল-বাসেন। কিরকম শান্তিতে খাচ্ছেন দশটা লোকের সামনে।

ঐ মান্ধাতার আমলের ফ্যানগুলো বন্ধ হয়ে গেলে উনি হাঁটুর ওপর কাপড় তুলেই বসবেন। তোমার মনে আছে 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র কোর্টরুম সীন? অথচ জেনো কাকা অশ্লীল নন। ভারি লাজুকও বটে। উনি মোহিনী জর্দা দিয়ে পান খান। কিন্তু পান করেন না।

আমি জেগে থাকলেও এ:কম ঘুমিয়ে পড়ি কেন? আজকাল এ রোগটা ধরেছে আমাকে। এ কোর্ট-ফোর্ট সব বাজে জিনিস। সব ভূয়ো। কোন ব্যাপারই নয়।

বছর চা'রক আগে। প্রিয়া বলছিল, আমি খুব মেলোড্ হয়ে গেছি। আমার অনেক ছটফটানি কমেছে। আমি আজকাল খুব একলা বোধ করি। কিন্তু, এ সমস্তই ছিল প্রিয়ার ভনিতাবিশেষ। ভাবলাম, আমাকে এহেন নির্জীবের মত বসিয়ে রেখে ও সমস্ত কি কথা? কেন, ও কি আমায় জেলাসও করবে না? আমি কি সহানুভূতি জোগাতে এসেছি ওকে? এক প্লেট মিষ্টির দিকে চোখ ঘুরিয়ে মনটাও ঘুরিয়ে নিলাম ওর থেকে। কিন্তু, ওকে যে দেখতেও বড় ভাল লাগে। ভাবলাম, দাঁড়িয়ে পড়ে অ্যাকিউজ করব কিনা, ইউ বিচ্ ইউ স্লাট্, ইউ ক্লিট্‌মিনেস্ট্রা, ইউ মিডিয়া, তুমি আমায় কি পেয়েছ? তুমি কাঁদতেও জান না? কিন্তু চোখের সামনে দেখলাম এক জোড়া ক্লান্ত চোখ। সোহাগে স্নাত। কিন্তু কারো চোখে নিবদ্ধ হওয়ার সামর্থ্যটুকুও যার নেই। চমকে উঠলাম ভেতরে-ভেতরে। প্রিয়া, তুমি কাঁদছ? না, এ কথাগুলো বলিনি আমি। বলতে পারিনি। বলা যেতে পারে, এসব আমি পারি না, কিন্তু দেখলাম প্রিয়া কাঁদছে। হয়ত প্রিয়াও সেটা জানত না। বড় দুঃখ হলো, আহা! মানুষের দুঃখগুলো তো এরকমই হয়। না জেনে কাঁদার মত

কান্না কী আছে? দু-ফোঁটা জলে এত দুঃখ গড়িয়ে পড়ে ভাবিনি। ইচ্ছে হলো, ওর গালে গিয়ে চুমো দিই। না, তাও দিইনি। কেবল বললাম, তোমার কিছু-কিছু দুঃখ আমি বুঝি। ও জানত, আমি বুঝি না। বুঝলে চুমু দিতাম। ওকে তাতে অবশ্য লজ্জাই দিতাম। কিন্তু ওর রাগ হতো না। শেষকালে ওকে একা রেখে সে-ঘরে চলে এলাম। এত নিস্পৃহ প্রিয়া যে, আমি যাচ্ছি জেনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল নাঃ ইউ রাস্কেল, ইউ বাস্টার্ড, ইউ ফুল, ইউ সন অফ এ............

মিশনের যে ভবনে আমি থাকতাম, তার ওয়ার্ডেন ছিলেন চণ্ডীদা। মাকে উনি খুব পছন্দ করতেন। প্রায়ই দেখা যেত মার সঙ্গে নানাবিধ সুখ-দুঃখের গল্পে মাতোয়ারা চণ্ডীদা। মাও সেই সুবাদে আমি কি রকম ব্যবহার করি, কি রকম থাকি—এই সব প্রশ্ন তুলতেন ওঁর কাছে। পরে মার কাছেই শুনেছি, চণ্ডীদা নাকি বলেছিলেন, আপনারা ওকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। ও খারাপ হতে চেষ্টা করলেও পারবে না। মার মুখে চণ্ডীদার এই অন্ধ-বিশ্বাসের টুকরো সমাচারটা শুনে মজ্জায় মজ্জায় কেঁপে উঠেছিলাম। যদিও জানতাম রামকৃষ্ণ মিশনের স্বার্থত্যাগী মানুষগুলির বিশ্বাসও খুব প্রবল, তবুও এই কথাগুলো আমাকে ভীষণ ভয়ে ফেলেছিল। যথার্থ খারাপ কী এবং কী কী খারাপ কাজ আমি করতে পারি, এই রকম একটা হিসেব-নিকেশ আমি অহোরহ করতে শুরু করলাম। দেখলাম, এতটুকু বেসামাল কাজে হাত লাগাতে গেলেও একটা গিল্ট কমপ্লেক্স জাগে। আমি কি খারাপ কিছু করে বসছি? এবং যদিও এ ধরনের প্রশ্নের কোন সদুত্তর হয় না, এই প্রশ্নের

তাণ্ডবলীলার থেকে আমার রেহাই দেখলাম না। মাকে তাই ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর একটায় বলেছিলাম, মানুষের এত এত বিশ্বাস কাঁধে চড়িয়ে বেঁচে থাকা মুশকিল। রূপাও যখন বলেছিল, আমি পাপ করছি ভেবে ওকে চুমু দিই, আমি চণ্ডীদার কথাগুলোই ভেবেছিলাম।

আমি পাপের কথায় আসতে চাইনি। কী পাপই বা আমি করেছি এযাবৎ? শুধু সংস্কারগুলোর ছায়ায় আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি। প্রথম দিন সিগারেট ধরিয়েও তো ভেবেছিলাম আমি পাপ করছি। রূপাকে নিয়ে কলেজের বাইরে পা রাখতেও তো লজ্জায় মরে যেতুম। বন্ধুদের কোন মজলিশেই আমি নিজেকে গুছিয়ে বসাতে পারিনি। সুনীতার মতন সোসাইটি গার্লের কাছে গিয়েও রামকৃষ্ণত্ব দেখিয়ে এসেছি। অথচ পাপ পাপ ভেবেই আমি বহু মজার তল্লাশ করলাম না। মাঝে মাঝেই নিজের দিকে চেয়ে (রূপা বলেছিল এই নিজের দিকে চাওয়াটাই আমার হিউব্রিস; আমি অন্য কোন দিকে চাই কী? বাকিটাও রূপার প্রশ্ন) আমি অ্যান্থনি বিভীসকে দেখেছি। মেরী অ্যাম্বর্লীর হাউজ পার্টিতে এক কোণের সোফায় বসে বিভীস। অন্যরা সব প্রেম করছে কিংবা তার প্রস্তুতি। বিভীস শুধু দেখছে ক্যান্টারবেরীর পানশালায় বসা চসারের মতন। একটা তৈরী সিচ্যুয়েশনে একটা আধিভৌতিক জীব।

আমার সিচ্যুয়েশন কোন অমোঘ কারণেই ট্র্যাডিশনের মত হাতে তুলে দেওয়া। বিনা চেষ্টায় পাওয়া। নিয়তির আয়তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বলা যেতে পারে পাওয়া এবং তাই নিয়ে ভুলে থাকা। বাৎস্যায়ন, দ্য সাদ, ফ্রয়েড, অমরু, আরেতিনো, পেত্রোনিয়াস না পড়ে এই বন্ধুগুলো

দেখলাম বেঁচে গেছে। এরা শরীরে শরীর মেলাতে পারে। জিবে জিব, ঠোঁটে ঠোঁট, গালে গাল মিলিয়ে কাম জাগিয়ে তুলতে দর্শন কি সাহিত্য লাগে না, গাড়ির সামনের সীটে বসে বলেছিল রতন। তখন ও আর রাধা একে অন্যের মধ্যে শিশুর মত নিক্ষিপ্ত। পিছনের সীটে তত্ত্ববাদী আমি শুধু চোখ চালিয়ে দিয়েছি গাড়ির জানালার বাইরে, গঙ্গায় ভাসমান নৌকোগুলোর দিকে। কিন্তু মনে মনে একবারও বলিনি, সাহিত্য, দর্শন সব ভেজাল। বরং প্রশ্ন করলাম, আত্মায় আত্মায় মিললে দেহের দৌড় কী বন্ধ হয়। জানি না, ফ্রান্সিস অফ আসিসির মত বলে মরব কিনা, 'আই হ্যাভ সিন্‌ড এগেন্সট মাই বডি, মাই ব্রাদার এ্যাস।" মনের মিল কখন ঘটে, কোন্ মুহূর্তে, কোন্ পর্যায়ে, কোন্ মানুষের সঙ্গে এবং কেন —এ প্রশ্নের কোন সমাধান শরীরের মধ্যে নেই। সুনীতাকে তাই আমি ছুঁইনি। ব্যবধান কমাতে না পেরে প্রিয়াকেও দিল্লীকা লাড্ডুর মতন অনাস্বাদিত রেখে গেলাম। রূপাকে স্পর্শ করে বুঝেছি ঐ স্পর্শ আমায় বিভোর করে (এ কথা আগেও বলেছি)। শুধু প্রশ্ন থাকে—আমার মন ঠিক কাকে কতটা চেয়েছিল ?

ভালবাসার কথায় মনটা কেমন গুলিয়ে যায়। এ আমি আগেও দেখেছি। ছোটবেলায় শুনতুম সংস্কৃত পণ্ডিতমশাই বলছেন, যাহা জীবনকে পরিবর্তিত করে তাহা জ্ঞান। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। বিনয় তো মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। ওটা লব্ধ; প্রাপ্ত; সংস্কৃত মনোভাব। কিন্তু মৈত্রেয়ী তাহা চাহিলেন না। বলিলেন, যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিং কুর্যাম্। সম্ভবত পণ্ডিতমশাই জানতেন না, বিদ্যা দুঃখও দেয়। একাকিত্ব দেয়। অতিরিক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হলে

বিচ্ছিন্নতা দেয়, অমানুষিকতা দেয়, মৃত্যু দেয়। কিংবা পণ্ডিতমশাই জানলেও এ কথা মানতেন না। মনটাকে ফিরে পাওয়ার মন্ত্র ভালবাসা। অথচ বিদ্যা একেও সন্দেহের পাত্র করে তোলে। আমি নিজেই তো দেখেছি, বেশী বেশী বই পড়ে আমি আমার বাল্যের সখাদের আলাদা করে ফেলেছি। ভালবাসার দ্বারা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা হারিয়েছি। পরে অসহ্য মনোবিকারে সেই বন্ধুদের কাছেই গিয়ে বলেছি, তোরা কষ্ট পাস আমি তোদের কথা ভাবি না বলে। অনুযোগ করিস আমি কেন তোদের সঙ্গে মাল টানি না। তাহলে আন তোদের বোতল। যত পারিস আন। আমি খাব।

সে রাত্রে ওদের থেকেও বেশী মদ খেয়ে ফেললুম। ওরা কেউ ঘুমোল, কেউ বমি করল। আমি 'সুবর্ণরেখার' বিজন ভট্টাচার্যের মতন শ্লোক আওড়ালাম। পরে ভয় পেয়েছি ভেবে, মাতাল হলে আমি কতকাল বক্‌তে পারি দেখে। আমার অস্বাভাবিক মনের স্তরেও দেখেছি লেখাপড়ার শিকড় গজিয়েছে। অন্য এক সময়ে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় বন্ধু বাপী আর ওর স্ত্রীর সঙ্গে বসেও আমি শাস্ত্র বলেছি। ওরা তাতে ভালবেসেছিল আমাকে। বলেছিল, এত তদ্গত কোন মানুষের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু ওরা জানত না তার কিছুদিন আগেই রূপা আমাকে ঝেড়ে ফেলে চলে গেছে। ওদের তারিফ আমায় সাহস দিত। জানতাম সেটা ভালবাসার তারিফ। শুধু প্রশ্ন থেকে যেত। কটা বইয়ের নলেজের জন্য কি একজন মানুষ অপর একজনকে এত কাছে আনতে পারে। পরে জেনেছি ওরা আমার নাড়িনক্ষত্র সবই জানত। আমার ওপর তবুও ওদের কোন করুণা ছিল না। বোধ হয় ওরা বুঝেছিল, নিঃস্ব না হলে ভালবাসার পাত্র হওয়া যায় না।

এই নিঃস্ব হওয়ার দায় থেকে পড়াশুনোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে সরিয়ে আনে। নাহলে রতনের মতন গাড়ী-পাগলা ছেলে যখন গাড়ীর নেশা ছেড়ে রাধাকে নিয়ে মাতল, তখন আমিই তো ওকে বলেছিলাম, কোন সংস্কারে নিজেকে বাঁধিস না। রাধার এককালে বিয়ে হয়েছিল তো কী? তোকে তো ও ভালবাসে। অথচ আমি জানতুম ঐ রকম এক সম্পর্কে আমিই যখন জড়িয়েছিলাম, তখন মনোবিদ্যার মহাপুরুষদের বচন সে ব্যাপারে বাগড়া দিয়েছিল। রতনকে দেখলাম স্কোলিমস্কির "ল্য দেপার" ছবির নায়ক মার্কের মতন যন্ত্র ছেড়ে মানুষ ধরতে। আমি জীবনে শুধু মানুষ ছেড়ে শব্দ ধরেছি। এক বন্ধু তাই জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিডমিনেণ্ট ফিলিং কী? আমি বলেছিলাম, লোনলিনেস্। ও হেসে বলেছিল, তুমি একা। একা। এটাই সত্য। মানুষকে দেবার মতন তোমার এক টুকরো একাকিত্ব আছে। তুমি সেটাকেই স্নেহ দিয়ে গড়ে তোল। আমি বলেছিলাম, কিন্তু সে তো আছেই। যুক্তি দিয়ে তাকে তো বলিষ্ঠ করা যায় না। ও বলল, একা। একা। তুমি একা—এটাই সত্য। সেটাকে তুমি জান। তোমার অবলম্বন শব্দের দ্বারা তাকে প্রতীয়মান কর।

নিজের নিভৃতে এক টুকরো একাকিত্ব। এ তো যন্ত্রণা নয়। আমি দেখলাম বা দেখলাম না। কিন্তু সেটা থেকে গেল। হঠাৎ এক দয়ার বশে রাস্তার ভিখিরিকে চার আনা পয়সা দেওয়াই তো মানবিকতা নয়। ওটা কম-বেশী এর তার মধ্যে আছে। এটাই সত্য। বা নেই। সেটাও সত্য। আমি একা এটা জানাই কেবল একাকিত্বের শুরু নয়, আরও একলা হওয়া নয়। বরং বেঁচে যাওয়া।

॥ ৭ ॥

হ্যাঁ, একদিনের জন্য আমি বেঁচে গেস্‌লাম। বন্যা এসেছিল শান্তিনিকেতন থেকে। বন্যা হাবুদার বোন, গান গায়। হাবুদা বিজ্ঞাপনের কোম্পানি চালান। ভীষণ দিলদার মানুষ। মাঝে মধ্যে আমায় ডেকে মদ খাওয়ান। সেদিন ডেকেছিলেন বন্যার সঙ্গে আলাপ করাবেন বলে। এবং সেদিনটি ছিল পঁচিশে বৈশাখ। বন্যা জোড়াসাঁকোতে গান গেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমি চমকে উঠেছিলাম। বুকের ভেতর আমার তখন হু-হু করে বাতাস বইছে। তাহলে কি কাকার কথা মিথ্যে। বন্যাকে কি চেয়েও আমি দরিদ্র হব না! ঘোর ভাঙল বন্যার কথায়, আপনি কী করেন? বললাম, এই সামান্য একটা কাজ আর কি। ও বলল, কিন্তু কাজের মানুষ তো অত গোমড়া হয় না। মনে আছে তার পরই আমি ভয়ঙ্কর বকতে শুরু করি। মদের পর ডিনার সারতে হাবুদা আমাদের নিয়ে গেলেন পার্ক হোটেলের দিসকোতেকে। হাবুদা আর বউদি নাচলেন সোনো মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত দিসকোতেকের লোক তখন অন্ধকার ঘরে নাচছে। আমি বললাম, আমায় মাফ করবেন, আমি সত্যিই নাচতে জানি না। বন্যা বলেছিল, আরে, আমি তো গ্রামের মানুষ। আমিও কি ছাই নাচতে জানি। কাজেই আমরা কেউ নাচলাম না। শুধু ওর হাতে ধরা প্লেট থেকে তুলে তুলে বাদাম খেলাম। প্রচণ্ড আবেগে

সেই কথাই বললুম যা এক রূপা ছাড়া কাউকে বলতে সাহস করিনি—আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। সেই ঝিলিক ঝিলিক আলোতে দেখেছি বন্যার চোখ দুটো কাঁপছে। বলল, আমি জানি। তুমি অবশ্য করে আমাদের ওখানে আসবে। বাড়ি ফিরে ভয় পেলাম, মদ তো খেলাম আমি, আর নেশা হলো কি ওর। তবু মনকে বোঝালাম, আমি যাব।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে সময়টা আমার জীবনে কি ? আমি কখন কি করি, কোথায় যাই, কবে যাব ভাবি, এসমস্ত ক আমার নিছক উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি ? আমি কি শেষ পর্যন্ত ঐ অভ্যাসেরই দাস ? রূপা বলেছিল, ভালবাসার মতন একটা বদ অভ্যাসও তো রপ্ত করতে পার। সেটা কর না কেন। বাবা বলতেন, যারা অভ্যাসের চাকর, তারা বাঁচে না। স্রেফ্ টিকে যায়। বাঁচতে হলে ভাবতে হয়। বদলাতে হয়। ঘা খেতে হয়। আর কাকাকে দেখেছি ডাল-ভাতের স্বাভাবিক অভ্যাসের মধ্যেই ধরা পড়তে। কেবল ছিটকে পড়েছিল দাদা। সমস্ত অভ্যাস জলাঞ্জলি দিয়ে ও দস্যিপনায় মেতেছিল। একটা শিশুর মতন খামখেয়ালী ভাব নিয়ে ছোটবেলায় বিয়ে করল। যেখানে যত বিপদ, ঝুঁকি সেখানেই ও গেল। বাবার কোন সৌভাগ্য হয়নি ওর পাগলামি দেখার। বাবা লেখাপড়া ভালবাসতেন। দাদা ধরেছিলেন হৈ-হুল্লোড। কিন্তু বাবারই কথা মাফিক ও বেঁচে গেল। ওকে শুধু টিঁকে থাকতে হলো না। সমস্ত ব্যথা, বেদনা পেরিয়ে ও বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দ পেল। তাই ওকে কখনো স্বাভাবিক কারণে কাঁদতে দেখিনি। শুধু সময় সময় রাগতে দেখেছি। কিন্তু সে রাগও বুঝি এক ধরনের খেয়ালিপনা।

আসলে দাদা সময়কে বিচ্ছিন্ন বিছিন্ন ভাবে ধরতে পারত। যেটা আমি পারলাম না। আমার আনন্দ মুহূর্তগুলোকেও ছেয়ে ফেলল স্মৃতি আর অনুভব। আমার যথার্থ দুঃখগুলোও তাই সময়ের সামগ্রিকতায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যখন রূপা চলে গেল তখন কাকার উৎকেন্দ্রিক মানসিকতাই আমায় চেপে বসল। চেয়ে ফেলতে, অনুনয় করতে, হাতে ধরে বুকে টেনে আনতে ভুলে গেলাম। যেন কোন দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, আফসোস নেই এইরকম এক স্থাবর বাস্তবিকতায় ডুবে গেলাম। আমার মনে হয় সার্কাসের পালোয়ানেরা যখন বুকে হাতি তোলে, ওরা তখন নিশ্চয় ভাবে এ হাতির তো কোন ওজন নেই। এ তো মানুষের মতনই হাল্কা। এবং যদিও ঐ বুকে হাতি নেওয়ার পেছনে অনেক কারসাজি লুকিয়ে আছে, তবুও ঐ সংকট মুহূর্তে হাতিকে হাতি মনে না-করাই সবচেয়ে বড় কারচুপি। আমার বুকেও দুঃখের পাহাড় চেপেছিল তুলোর প্যাকেটের মতন। ভাবলে ঘৃণ্য মনে হয় নিজেকে।

অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় যখন শব্দগুলো এসে আছড়ে পড়ে বুকে। এক রাত্রে ধড়ফড় করে উঠে বসেছি বুকে দুটো শব্দ ধরে। আমার বুকে এযাবৎ এ দুটো শব্দই বেশি খেলাধুলো করে। আমি এ দুটিকে চিনি কিনা জানি না। বন্ধু খোকন কি সমর বলে, ঐ শব্দ দুটোকে তোর চিনে নিতে হবে। মদের মাথায় একদিন প্রচণ্ড রেগে গেল ওরা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, কাপুরুষের মতন নিজের পূজো করে চলেছিস তুই। চেন্ তোর শব্দকে। শালা পণ্ডিত হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, আমি কান চেপে উঠে আসতে পারিনি সেখান থেকে। যখন বেরিয়ে এলুম তখনও শুনছি

ওরা দুজন বলছে, শালা ভালবাসাও জানে না। গলায় দড়ি দিয়ে মরতেও পারে না। ওদের ও-কথা শুনে আমি আনন্দে পাগল হয়ে পড়লাম। মাথা ঘুরে বসে পড়লাম ফের ঐখানেই। যে যে শব্দ আমি ঘুমেও আচ্ছন্নভাবে হাতড়াই, সে কথাই ওরা তুলে দিল আমাকে এক খিস্তির আধারে। সত্যিই তো! ভালবাসা আর মৃত্যু—এ দুটো শব্দই তো আমাকে ঘিরে ঘিরে চলে। একদিকে পরিপূর্ণ হওয়া। অপরদিকে ফুরিয়ে যাওয়া। ভালবাসা আর মৃত্যু। এ দুটো শব্দই তো আমার মনের মেঘের পৈঠায় পা ফেলে ভেসে চলেছে কতকাল ধরে। সহসা ইচ্ছে হলো আমি ভাসব। বললাম, ওরে তোদের টাকা দিচ্ছি, একটা বি-কে'র পাঁইট আন। তোরা খা। তোদের কথায় আমি ভাসব এবং ডুবব। তোরা মদে বরফ ভাসালে আমি ভাসব। তোরা মদে ডুবলে আমি ডুবব। মনে আছে, সে রাত্রে আমি প্রচুর কবিতা শুনিয়েছিলুম ওদের। আর খোকনকে বলেছিলাম, তুই কবিতা লিখিস না কেন। সেই ধরনের কবিতা যা আমাকে বারবার টেনে আনবে তোদের কাছে বেঁচে থাকার প্রেরণায়। খোকন জিজ্ঞেস করল, কেন, কবিতাকে তুই কি চোখে দেখিস আজকাল? বললাম, "অ্যাজ দি লাঙ্গোয়েজ অফ সার্ভাইভাল।" খোকন সেদিন থেকে কবিতায় ফিরে গেসল।

এইভাবে কথা বলে যাওয়াটাই দুষ্কর। ভাষাটা কেমন ক্লান্ত হয়ে আসছে। কিংবা হয়ত অনেকগুলো ভাষা এসে কণ্ঠনালীতে ঝগড়া করছে। কি বলি বলুন!

ক্লান্ত কাকা শুয়ে পড়ে আছেন মৃত্যুতে। বাবা কিন্তু শেষ শয্যায়ও হাসছেন। কৈ, তিনি তো হারেননি। আমি

কাকার মাথার কাছে বসে আছি। বিভ্রান্ত। বাবার পায়ের সন্নিকটে উপবিষ্ট, বিস্ময়ে। জানি, যে-কোন মৃত্যুই আমাকে বিভ্রান্ত, বিস্মিত করে। বাবার শেষ হাসিতে ইঙ্গিত আছে, সাহেব, বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। কাকার মূক নিদ্রা কিছুই বলে না। বুঝি না সে কি মরণেরই হাতছানি! কিন্তু না; কাকা তো চাইতেন আমি বাঁচি। বেঁচে থাকার ওপর আমার অনীহা তৈরি হোক—এ তো কাকার প্রস্তাব হতে পারে না। তবে বাবার কথাটাই সোচ্চার হয়, সাহেব, এমন ভাবে বাঁচবে যাতে মৃত্যুর পরেও সে জীবনের দিকে তোমার তাকাবার ইচ্ছে থেকে যায়।

বাউল বলেছিল, 'নীলকমলার ঘরে আমি যাব কেমনে।' বাউলের ঘর নেই। তার লক্ষ্য ঊর্ধ্বমুখী। আমি হাত-ছানিতে বুঝিয়েছিলাম তাকে, আমিও উদ্বাস্তু। বাইরেই যেতে চাই। ও আসেনি।

বলেছিল শান্তিনিকেতনের কিছুদিনের শিক্ষক অক্সফোর্ডের ছেলে অলিভার, আমি একটা যেমন-তেমন বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস করার মতন বিশ্বাস। এথিইজম্ আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। বললাম, তাহলে খৃস্টানদের সঙ্গে এলে কেন পাটনায়? ও বলল, যেমন করে তোমার মত হিন্দু ছেলে এসেছে, ঠিক তেমনই। বললাম, ক্রাইস্টের প্যাশন তোমায় মুগ্ধ করে না। ও বলেছিল, ঠিক ততটাই যতটা জ্যঁ বাপ্তিস্ত ক্লামসকে করেছিল। তুমি কামুর "ল শ্যুৎ" পড়েছ? বললাম, পড়েছি। কিন্তু তুমি তো জাজ-পেনিটেন্ট নও। ও বলল, আমরা সবাই জাজ-পেনিটেন্ট। আমরা সবাই নিজের এবং অন্যের বিচার করে ফিরি। এই খৃস্টান সেমিনারে তোমার উপস্থিতিই তোমার আত্মবিচার। আমায় বিশ্বাস নেই, এই বলাটাই

আমার আত্মবিচার।

পাটনা থেকে ফেরার পথে অলিভার বলল, হেগেলের দৃষ্টিতে দেখলে আমার ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণ সংবদ্ধ সত্তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রতিনিয়ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। বিক্ষিপ্ত তাঁর খণ্ডচেতনার মধ্যে। আমার ঈশ্বর তাঁর সত্ত্বাকে এখনও চেনেননি। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্র্যগুলি একবদ্ধ হলেই তিনি আমার ঈশ্বর হবেন। তখন হয়ত আমিও ঈশ্বর। বলে হাসল ও। আমি হেগেল বুঝতাম না, অলিভারকেও না। তাই বললাম, তুমি তবুও তো ঈশ্বরকে চাও। সেক্ষেত্রে মানুষকে দিয়েই শুরু কর না। জান তো আমাদের মুনিরা···অলিভার আমার কথার মধ্যেই শুরু করল, সেক্ষেত্রেও তো মার্কস আছেন। যে দ্বন্দ্বের মাঝখান দিয়ে হেগেলের ঈশ্বর তাঁর বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে ব্যস্ত, সেই দ্বন্দ্বেই তো বিধৃত মার্কসের মানুষ।

অলিভার ওর কথাগুলো দিয়ে আমাকেই একলা রেখে গেল। কলকাতায় ফেরার মাস কয়েক বাদে গেলাম শান্তিনিকেতনে ওর সঙ্গ পেতে। শুনলাম বেচারী ম্যালেরিয়ায় পড়ে ফের দেশে ফিরে গেছে। বিলেতের ছেলে মশার কামড়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল। সেবার আমি শান্তিনিকেতনের বনে-উপবনে একটা লক্ষ্মীছাড়ার মত ঘুরে বেড়ালাম। সেখানকার মশাগুলোর উপর ভারি রাগ হলো। শোবার আগে গুণে গুণে দশটা মশা মারলাম। শালা, ইয়ার্কি পেয়েছ! শুধু কামড়ান, শুধু কামড়ান। মনে পড়ল, ঠাকুরের ছারপোকা মারার কাহিনী। বলেছিলেন, বাঁচতে হলে তো মশা-মাকড় মারতেই হবে। ওতে পাপ হয় না।

কিন্তু বিশ্বাসকে খুন করলে কি পাপ হয় ঠাকুর? মা তো বলেন, বিশ্বাস পরের কথা। আগের কথা ভালবাসা।

যাকে ভালবাসলাম, তাকেই তো বিশ্বাস করলাম। কিন্তু মা, রূপা কি একথা জানত। ও হো! তুমি তো আবার রূপাকে চেনও না। প্রিয়াও কি আমাকে বিশ্বাস করে? বিশ্বাস, মানে সেই বিশ্বাস যা ভালবাসার থেকে উৎসারিত হয়। নিখাদ। কিন্তু আগেও তো বলেছি,—ভালবাসা ঠিক ভাল সাজার মধ্যে নেই। প্রিয়ার সঙ্গে আমি খু·' ভাল মানুষ। প্রিয়াও আমার সঙ্গে তাই। আমরা কেউ কাউকে চুমু খাই না, দাঁত বসিয়ে কামড়াইও না। সম্ভবতঃ এর অর্থ—আমরা উভয়ের কাছে অচেনা। আমি জানি না ওর শরীরের কোনখানটায় উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি। আর ও জানে না আমার উত্তেজনা এলে ঠোঁট কাঁপে, কথা গুলিয়ে যায়। প্রেমের আলাপচারীতে আমি নির্বাক হয়ে যাই। ভাল-বাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি অপগণ্ড উল্লুক। মাফ করো প্রিয়া, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় আমি বহুবারই নিস্তব্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি কিছুই বোঝনি। তুমিও একটা উল্লুক।

হয়ত উল্লুক আমরা সবাই। যদি একটা উইলিং সাসপেন্সন অফ ডিসবিলীফ কবিতা কি আর্টের কেন্দ্রে থাকে, একটা উইলিং সাসপেন্সন অফ র‍্যাশনালিটি মানুষের বেঁচে থাকার গোড়ায় নিশ্চয়ই আছে। উল্লুক হয়ে থাকাটাই বুঝি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁরা পারলেন না তাঁরাই তো দেক্লাসে হলেন। যেমন শ্রেণীচ্যুত হওয়ার চেষ্টা দেখি মানিকবাবুর কি জর্জ অরওয়েলের। প্রেমের ক্ষেত্রেও এক ধরনের শ্রেণী-সংকার দরকার। এম-এ পরীক্ষার শেষে যখন হাতে কাজ রইল না, চোখের সামনে থেকে রূপাও উধাও হলো, তখন মনে আছে স্তাদহাল পড়েছিলাম। দেখলাম,

পাদ্রীর সুউচ্চ পাটাতন থেকে নেমে আসছে জুলিয়ান সোরেল মাদাম রেণালকে ভালবাসতে। অবৈধ সে ভাল-বাসা, কিন্তু দুর্নিবার। সে পরিণতি যদিও মৃত্যুতে, তা ভালবাসাতে অগ্নিশুদ্ধও বটে। ভাবলাম, আমি তো উল্লুকই রইলাম। কেবল কামনার লাটাই গোটালাম। নিজের ভিতরেই প্যাঁচ খেললাম। যেদিন ঘুড়ি কেটে গেল, সেদিন মাঞ্জা দিয়ে জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করলাম। তবে এক একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি দর্জি হলে রূপা ওর শায়া, ব্লাউজ, সেমিজ বানাতে আমার সামনে এসে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে না?

কিংবা বলা চলে, ভালবাসায় কোন শ্রেণীতত্ত্ব নেই। আমাদের ছোট ছোট অহংকারগুলোই ওখানে এক-একটা শ্রেণী। ওগুলো ডিঙ্গোতে আমরা পারি না, তাই অজুহাত দিই। হয়ত আমার সমস্ত আত্মকথনই একটা বিরাট অজু-হাত। এত বেশী বলাই হয়ত অনেক কিছু লুকোবার জন্য। আমার সমস্ত স্বীকারোক্তিই হয়ত একটা ভয়ঙ্কর নার্সিসিজমের ফলশ্রুতি। রূপা হয়ত বলবে, ভালবাসার অহঙ্কারে আমি ছিলাম অস্কার ওয়াইল্ড। হয়ত ওর সন্দেহও জেগেছিল আমার সঙ্গে হনিমুনে গেলে আমি কাস্টমস্ চেকিঙে ঘোষণা করব, আই হ্যাভ নাথিং টু ডিক্লেয়ার এক্সেপ্ট মাই লাভ ফর দিস ওম্যান। এবং সেখানেই আমাদের প্রেমের অপমৃত্যু ঘটবে। রূপা বলত, তোমার সমস্ত বাগ্মিতাই মিথ্যে। তোমার সমস্ত নিস্তব্ধতাই সত্যি। এখন বুঝি, রূপার ভালবাসার সমস্ত প্রোগ্রামটাই ছিল আমাকে নির্বাক করার একটা একাগ্র প্রস্তুতি। ওকে দুঃখ দিয়ে ওর এই প্রস্তুতিকে প্রায়ই বলতাম, যৌন সমবেদনা।

বাবা মারা গিয়েছিলেন হ্যারিংটন নার্সিং হোমে। বালিশের তলায় কেসের ফাইল নিয়ে ঘুমোতেন বাবা। আর খালি জিজ্ঞেস করতেন, সাহেব কী করছে? সাহেবকে আনোনি কেন? পরে আমায় যেদিন নিয়ে গেলেন কাকা, ডক্টর ট্রয় বললেন, ওঁর অবস্থা ভাল নয়। ডিস্টার্ব না করলেই ভাল হয়। ডক্টর ট্রয়ের একটা পা কাঠের। ওঁকে দেখে আমার দুঃখ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি কষ্ট হয়? বললেন, হয়। তোমার জন্য। আমার জন্য? কেন আমার কী হয়েছে? বুঝতে পারিনি বাবার তখন ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছিল। বুঝছিলেন আর দেরি নেই। মাঝেমধ্যে বলছিলেন, সাহেব অত ছোট। ওকে কে দেখবে? আমার বেশী বয়সে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। এবং শেষ মুহূর্তে সিস্টারকে বললেন, আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না, সিস্টার। এবং মারা গেলেন।

বাবার সঙ্গে আমার কথা হলো না। বাবার মুখে আগুন ঠেকিয়ে বসে আছি চিতার অদূরে। শুনলাম, সাহেব, তুমি দুঃখ পেয়ো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। এ আগুন আমাকে পোড়াতে পারবে না। এই দেখ না আমি তোমায় স্পর্শ করলাম। আচমকা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগল। আমি বললাম, বাবা, দেখ মা কাঁদছে, কাকা কাঁদছে। আমায় তুমি কাঁদতে দাও। আবার একটা হাওয়া লাগল শরীরে। আমার কান্না আটকে গেল। শুনলাম, কাকা বলছেন কাকে যেন, দাদা কাউকে কাঁদতে দেখতে পারতেন না। দেখলে রেগে উঠতেন। আর আজ আমরা সবাই কাঁদছি। কী হতে কী হয়!

সত্যি, কী হতে কী হয়। কাকার চিতার পাশেও

আমার কান্না হঠাৎ থেমে গেল। যতক্ষণ শেষ শয্যায় শুয়ে-ছিলেন কাকা, কী নিস্তব্ধ সে শয়ন। যেন একটা মর্মর মূর্তি শুয়ে আছে। যেই আগুন লাগল চিতায়, অমনি কথা শুরু হলো কাকার। সাহেব, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমায় কত চাও। কিন্তু তুমি কাঁদছ না। না, কেঁদো না। আমি তো সুইসাইড করিনি। করলে তুমি রাগ করে কাঁদতে। আমি মরে গেলাম মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে। আমি জানতাম না আমার মাথায় অত রক্ত ছিল। আমি জানতাম আমি গবেট। আমার মাথায় গোবর আছে। কিন্তু সেখান দিয়ে রক্ত গড়াল। আমি জানতাম কোন মেয়েমানুষকে ভাল না বাসলে মাথায় ছাই জমে। কিন্তু রক্ত এল কোত্থেকে? আমি বললাম, তোমার বুকেও অনেক প্রেম ছিল। তোমার গায়ে সরষের তেল ডলে দিতে দিতে আমি তার গন্ধ পেয়েছি। আর তোমার হাতে অনেক আদর ছিল। তুমি আমার পিঠে হাত বুলোলেই আমি তা ধরতে পারতুম। একটা হাওয়া এসে আমার শরীরের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে বয়ে গেল।

সময় সময় মনে হয়, কাকা বোধ হয় বহু আগেই বুঝে ফেলেছিলেন যে হৈ-চৈ করে শুধু জীবনের ব্যস্ততাই বাড়ান যায়, মজা লোটা যায় না। 'হলো মেন'-এর শেষ চারটি পঙ্‌ক্তির মর্মার্থ কাকার মুখে হাজারো বার শুনেছিলাম বিভিন্ন যুক্তি বেযুক্তিতে। মনে আছে কাকা ছুটি-ছাটাতে গ্রামদেশে বেড়াতে যেতেন। কিন্তু শহর এড়াতেন বিলক্ষণ। কাজেই একবার এক বন্ধু বোম্বাই যাওয়ার প্রস্তাব দিলে ফস করে বলে বসলেন, ময়লা-ধরা বাড়িঘরের থেকে সবুজ ঘাস চোখের পক্ষে ভাল। আপনি বোম্বাই যান। আমি

বীরভূম যাব। এবং গেলেনও।

এখন ভাবলে বুঝি বোম্বাই-যাওয়া পার্টিরাই বেশী জানে, বেশী তথ্য সংগ্রহ করে, এবং ভেতরে ফাঁপা হয়ে যায়। বীরভূমমুখী মানুষগুলোই বোঝে বেশী। আরও গভীরে যায়। গভীরে যায়, কারণ কোন লক্ষ্যে না-যাওয়ার চেষ্টা থেকে গভীরত্বে যাওয়া সহজ। লক্ষ্য থাকলে লক্ষ্যে যাওয়া হয়, কিংবা দূরে। কাকার যাত্রা ছিল ভিতরে, গভীরে। এবং এ ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল বুঝতেন বাবা। তাই ওঁর বন্ধুদের প্রায়ই বলতেন, তোমরা হলে বেণুবনে হাতী। আর ঘেঁটু হলো ফুলের অভ্যন্তরে অদৃশ্য মৌপেয়ী ভ্রমর।

বস্তুতঃ, কাকা এত নির্লিপ্ত হয়ে বেঁচেছিলেন যে চিত্রগুপ্তের খাতায় ওঁর বিষয়ে টীকাটীপ্পনি প্রায় না থাকারই কথা। সংসারে কোন হুল্লোড় না করে এভাবে বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব। কাকাও হয়ত সেটা বুঝতেন এবং বাবার অসম্ভব জ্যান্ত অস্তিত্ব দেখে বলতেন, আমি কি বেঁচে আছি, না মরে গেছি? এবং গায়ে চিমটি কেটে পরখ করে নিতেন।

সব মানুষেরই মনে হয় গায়ে চিমটি কাটার এক-একটা সময় আসে। রূপা যখন চলে গেল, আমি এক-আধবার ভাবলাম—আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি। শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, একটা ট্রেন ধরব। অন্য প্ল্যাটফর্মে তখন একটা আলগা ইঞ্জিন ইন্ করছিল বেশ জোরে। ভাবলাম লাফিয়ে পড়ব নাকি সামনে যদি মরতে পারি ঐভাবে। ইঞ্জিনটা প্ল্যাটফর্ম ছুঁলো, কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। ভাবলাম, এটা কি হলো? পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে! আমি তো ক্রমান্বয়েই মরছি। এর

থেকে আর ভাল মরা কী আছে? প্রত্যেক মুহূর্তে একটা-না-একটা স্মৃতি এসে ছোবল মেরে যাচ্ছে অথচ আমি হাল্কা ঔদাসীন্যে মশগুল। এ তো সাক্ষাৎ মৃত্যু। মরে পচে যাওয়াও বলা চলে। সুইসাইড করার মতন একটা সদর্থক কাজ করলে এই নেতিবাচক অস্তিত্বটা কোথায় যাবে? যে জীবন কোন দায়িত্বই গ্রহণ করল না, তাকে মেরে ফেলার মতন দায়িত্বই বা আমি নেব কেন? স্পষ্ট দেখলাম, আমাকে নিয়ে আমার নিজেরই একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। হয়ত বলেওছিলাম, রাস্কেল, তোকে নিয়ে আমি তো আর পেরে উঠছি না। তুই দয়া করে ট্রেনের তলায় যা।

অথচ যেদিন নরেন্দ্রপুরের ঝিলটাতে ডুবে যাচ্ছিলাম, সেদিন কিন্তু বাঁচার জন্য ছটফট করেছি। বারংবার মার মুখ মনে পড়ছিল তখন। চেঁচালাম, বাঁচাও! বাঁচাও! দূর থেকে সাঁতরে এসে স্বপন আমায় তুলল। পাড়ে এসে বললাম মনে মনে, মা, তুমি থাকতে আমার মরা অসম্ভব। আমি দুর্বল হতে পারি, অপদার্থ হতে পারি, কিন্তু নিমকহারাম নই। আর তাছাড়া তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? দরকারটাই বা কী?

ডুবে যাচ্ছিলাম বলেই হয়ত ঝিলটার সঙ্গে একটা নতুন হৃদ্যতা জন্মাল। সেদিন থেকে প্রায়ই ঐ ঝিলের পাড়ে আমি বসতাম। দেখতাম, গ্রীষ্মে, শীতে, বর্ষায় ওর জল কতটা নামে, কতটা ওঠে। দেখতাম ডুবলে আমি ঠিক কতটা তলিয়ে যেতাম। জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়লে যদিও মানসচক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত বেটোফেনের চন্দ্রালোকগীতিকার তল্লাস পেতাম না, তবে এটুকু সঠিক বুঝতাম,—ঝিলটার একটা জ্যান্ত

মূর্তি আছে। এবং সে চরিত্র শুধুই নৈসর্গিক নয়, আধ্যাত্মিকও বটে। আর পাড়ের যেখানটায় বসতাম ঠিক তার পাশেই ছিল একটা ছোট্ট ইমারত, যার মেঝেতে পায়ের আঘাতে সুন্দর সুর বাজত পাথরের ছাউনিতে। শুনেছিলাম, কোন এক মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মিশন কিনেছিল ঐ জমি। সেই ব্যবসায়ীর বাঈজী নাচানোর ঘর ছিল ঐ ইমারত। বাঈজীর পায়ের বোলের সঙ্গে পাথরের ছাউনিতে সুর উঠত। আর আমার ধারণা ছিল কোন-না-কোন দিন ঐ ঝিলের জলে দু-একটা বাঈজীর লাশ ভেসে উঠবে। হয়ত কোন চাঁদনী রাতে ফের কত্থকের বোল বাজবে ঐ বাড়িটায়। কত্থকের ভাও দেবে বাঈজীরা অদৃশ্য কোন গায়কের খাম্বাজ কি পাহাড়ী ঠুংরীর সঙ্গে সঙ্গে। এবং মনে আছে ঐ বাড়িটায় বসেই একদিন অসীম গান ধরেছিল কলাবতী রাগে। সন্ধ্যে পড়তে পড়তেই গা ছমছম করে উঠল। এই বুঝি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়াবে ঝিন্নন বাঈ,—সাব, ফরমাইয়ে। আমরা তখন সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যাব। ঝিন্নন বলবে আমাকে দেখিয়ে, উ সাব এক ওয়াক্ত হমারে পাশ আতে আতে হী রুক্ গয়ে থে। উনকো লেনেকো আয়ে হ্যাঁয় হম সব। এবং আমিও শান্তভাবে উঠে ওদের সঙ্গে নেমে পড়ব জলে।

ক্রমশঃই এগিয়ে চলেছি আমি। একবার দেখলাম অসীম আর সুমন্ত হাঁ হয়ে দেখছে। আমার তখন বুক অবধি জল। এবার মাটি সরে গেল, শুধু জলই খেলছে পায়ের তলায়। কিন্তু আমি চেঁচাচ্ছি না, বাঁচাও! বাঁচাও!

কিন্তু আমি কালোয়াত হতে পারলাম না। ছিটকে

পড়লাম ফের বইয়ের জগতে। মনে হয়, ঝিন্ননের সঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া আমার শক্তির বাইরে। কেবল ওঁকে দেখা এবং কিয়দ্দুর অনুসরণ করা। এবং আমীর খাঁও তাই বলেছিলেন, শিল্পীর নিত্যসঙ্গী তাঁর ব্যর্থতা। তাঁর ফ্রাস্ট্রেশন। যে শিল্পী হয় সে ঐ ফ্রাস্ট্রেশনের মোকাবিলা করে তাঁর শিল্পের নতুন পণ্যের সাহায্যে। যে শিল্পী হতে পারল না, সে বেছে নিল পয়সা, সাময়িক যশ, কিছু প্রতিপত্তি। বন্ধু বাপীকে দেখেও এই তত্ত্বটা আরো খোলতাই হয়। আসলে শিল্পীর ভুলে থাকার সামগ্রীও প্রচুর। কিন্তু অনেক কিছু পাওয়ার পরেও বাপী বলে—এ সমস্তই বাতুল। সঙ্গীতে না মজলে, এ দিয়ে কী হবে? আমি গান চাই। অথচ আশ্চর্য! এই কথাই তো বলেছিলেন নীৎশে—এ লাইফ উইদাউট মিউজিক ইজ এ মিস্টেক। হ্বাগনার শিষ্য নীৎশে জানতেন মানুষের সমস্ত জ্বালাই ব্যক্ত সুরে। এবং নীৎশের মত যন্ত্রণাই বা পেলেন ক'জন!

তাই বাপীকে বলেছিলাম, আমি তো শিল্পী নই। আমি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নই। তবে স্রেফ্ ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি করার মধ্যে যদি কোন শিল্প থেকে থাকে, তবে আমি ঐ শিল্পের মিকেলাঞ্জেলো। আমি ফ্রাস্ট্রেশন তৈরীর রসায়নটা জানি। কতটা ভালবাসলে, কতটা কী চাইলে এবং তা না পেলে এবং কীভাবে না পাওয়ার বন্দোবস্ত করলে ফ্রাস্ট্রেশন আসে, সে তত্ত্বে আমি নিউটনীয় সত্য স্থির করে যাব। বাজার ভাল দেখলে তা নিয়ে ব্যবসায় নামা যেতে পারে। উপরন্তু কতটা স্মৃতি মেশালে ফ্রাস্ট্রেশনকে আরও উপাদেয় করা যায়, সে সংখ্যান-তত্ত্বটাও দিয়ে যাব। মনে হয় আমাদের দেশে এ ধরনের ইণ্ডাস্ট্রির প্রভূত সমাদর হবে।

এত-শত জানা সত্ত্বেও ধাক্কা খেলাম রূপার কথাতে—আমি চলে যাচ্ছি জেনেও তুমি কাঁদছ না। তুমি কাঁদতে চাইছও না। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! আমি এই তো চাই। তুমি হাসবে। বরাবর হাসবে। যেভাবে তুমি হাসতে হাওয়াতে আমার বুকের কাপড় উড়ে গেলে। দুষ্টু অথচ প্রাণখোলা হাসি। যে হাসি আমি চোখ বুঁজলেই শুনতে পাই। এসো, কাছে এসো। এই নাও চুমো। আর কখনো চেয়ো না। আমি এখন থেকে তোমার নই। একি! তুমি তো হাসছ না। তুমি দর্জিটর্জি কী সব বলছ! ঐ দেখ, ঐ বারান্দায় ফার্স্ট ইয়ারের একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করছে। একদিন ওরাও প্রেমে পড়ে যাবে। তারপর হয়ত একদিন ওদেরও ছাড়াছাড়ি। কিন্তু ওরা আমাদের মত মিশতে পারবে না। ওরা কেন, কেউ পারবে না। তোমার মতন একটা পাগল ছেলে আর আমার মতন একটা···না থাক···নাই বা বললাম। কী, তুমি কিছু শুনছ তো? এ্যাই! এদিকে দেখো।

আমি দেখলাম। রূপা কাঁদছে। আর আমার নজর শুধু সরে যাচ্ছে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে। রূপাকে কাঁদতে দেখা কঠিন কাজ। বললাম, ছিঃ! কাঁদতে নেই। তুমিই তো আমাকে হাসতে বললে। এই দেখো আমি হাসছি। কী ভীষণ হাসছি। মনে হচ্ছে যেন লাফিং গ্যাস নিয়েছি বুকে। দেখো কী ভয়ঙ্কর হাসি আমায় পেয়ে বসেছে। হয়ত হাসতে হাসতে জানালা দিয়ে লাফও দিতে পারি। তাহলে দেখবে আমি একটা অদ্ভুত সুন্দর হাসিমাখা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে আছি প্রেসিডেন্সীর ঐ এক চিলতে বাগানে।

॥ ৮ ॥

ফাদার আমোর কি বিভূতিদাকেও আমি দিনের পর দিন ব্যতিব্যস্ত করেছি এই সূত্রেই। কিছু করতে হবে। একটা কিছু করা দরকার। ফাদার আমোর কি বিভূতিদা উভয়েই প্রৌঢ়। তাঁদের করাকরির যুগ শেষ। একজন বই-পাগল। অপরজন গান-পাগল। দুজনেই বলেছেন, নিশ্চয়ই করবে। সত্যিই তো, কিছু একটা তো করতেই হবে। ফাদার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন কিছু করতে কি তোমার ভাল লাগে? বলেছিলাম, আগে কাজটা কি শুনি? বললেন, প্রেম কর। বললাম, ফাদার আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? উনি বললেন, ঠাট্টা করব কেন। আমি চাই এমন কিছু কর যাতে জীবনের সমস্ত মূল্যগুলির সম্প্রদান আছে। তুমি তো দস্তয়েভস্কি পড়তে ভালবাস। কিন্তু পরিষ্কার বল তো দস্তয়েভস্কির ঐ ন্যাংটো করে দেখান মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্যিই তোমার ভাল লাগে? তার চেয়ে কি মন ভোলান প্রি-রাফেলাইট কবিতা পড়া সুখকর নয়? তাহলেও তুমি ঐ রুশটিকে নিয়ে এত প্রশ্ন তোল কেন আমার কাছে? বলেছিলাম, ভাল লাগে বলে। ফাদার বললেন, ওভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায় না। বরং বল, ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল লাগে।

প্রৌঢ় পাদ্রীর এই কথা আমাকে এখনও জ্বালিয়ে যায়। আমার সমস্ত সত্তার মধ্যেই ঐ দ্বন্দ্বটুকু আশ্রয় নিয়েছে।

আমার মনেও তো হয়েছে বহুবার এ জীবন আমার ভাল লাগে না। অথচ একবারও তো জোর গলায় বলে উঠিনি সে কথা। একটা সুইসাইডের কথা আমি রূপাকেও বলেছিলাম কিন্তু সে সুইসাইড কি শেষ হবার জন্যই? জানি না। হয়ত একটা অনুযোগ থেকেই বলেছিলাম কথাটা। যে অনুযোগ থেকে প্রিয়াকে বলিনি, তোমায় আমি ভালবাসি। সম্ভবত আমার সমস্ত বলা এবং না-বলা ঐ সুইসাইডের মতই অনুযোগভিত্তিক। কামুর মত সুইসাইডকে রেফরমেশন হিসেবে তুলে ধরার চেতনা আমার কখনই জাগেনি। জীবনের বহু ক্ষেত্রে 'না' বলেছি; কিন্তু কখনই বিদ্রোহের সুরে নয়। বিদ্রোহীর 'না'য়ে যে দূরের পজিটিভ স্বপ্ন আছে তা আমার নেই। আমার 'না' মানে পারলাম না। হয়ত পারতেও পারতাম। জানি না। আমার আত্মবিশ্বাসে যা কুলোল না, তাই শেষে 'না' হয়ে গেল। কে যেন বলেছিল একদিন, তুমি এত নেতিবাচক কেন? তোমার পার্সোনালিটি কোথায়? বিভূতিদাও বলতেন, তুমি তো অনেক কিছুই পার। 'না' বলতে পার না কেন? আমিও ভেবেছি থেকে থেকে আমার 'না'-তে উত্তরণ কবে? আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি—এই তিন সত্যকে যদি হাড়েমাংসে অনুভব করতে পারি তবে কেন পারি না মানুষকে জানাতে এ জিনিস কি ও জিনিস আমাতে নেই। অর্থাৎ ঐ না-থাকা আমার সত্তারই এক গুণ। ঐ না-বলা আমার বক্তব্য, আমার বিদ্রোহ, আমার এসেন্স। সে এসেন্স আমার চেষ্টায় পাওয়া, ধরা, রপ্ত।

শেষকালে জীবনের প্রত্যয়, বিভক্তি, সন্ধি, সমাসগুলি এই ভাবে কুরে খাবে আমাকে। যমের সম্মুখে দণ্ডায়মান আমি

নচিকেতা দেখব যমেরও আমাকে দেবার কিছু নেই। তবু নচিকেতা চেয়েছিলেন দৃষ্টি, পরিপ্রেক্ষী, জ্ঞান। আমার দশা কাফকার 'কে'র মতন হবে, যম আমাকে বেঁধেই রাখবেন। আমার সত্তা এবং স্বপ্ন সেখানে ধরা পড়বে। উনি কিছুই বলবেন না ঐ কাফকার পুলিশগুলোর মতন। আমার বিচার, জরিমানা, দণ্ড হবে। কিন্তু আমি জানব না কেন। ঐ বিচার কাকাকেও পেয়ে বসেছিল। বলতেন, আমার সম্বন্ধে যমের প্রশ্ন হবে, তুমি মর্ত্যে বেঁচেছিলে না এখন বেঁচে আছ? তুমি তো বাপু না জন্মালে না মরলে। বাঙালী ভদ্রলোকদের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর মধ্যিখানের এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার যেন কোন ব্যাখ্যাই হয় না। কাকা বিয়েও করলেন না। জীবনের একটা এসেন্স নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামালেন না। শেষে মরার মত মরলেন না। শুধু মরার ফন্দি কষলেন বহুদিন যেন ওটাই জীবন। এ ক্ষেত্রে যমও বুঝি মিথ্যে হয়ে পড়ে।

আমি স্বপ্নতেই পাই সেই সঙ্গ, যা আমার দিনের দৈন্য মোছাতে পারে। আমি দেখি তাদের যাদের চোখ মেললে দেখি না। আমি স্বপ্নে তাদের গভীর অঙ্গে স্পর্শ করি। স্বপ্নে স্বপ্নে রূপার গর্ভে আমার সন্তান হয়েছে তিন বছর হলো। ওর ছেড়ে যাওয়ার আগেই ও আমার পরিণীতা। বন্যার চোখ দেখলাম সেই স্বপ্নেই। রূপার সঙ্গে সহবাসকে ও যন্ত্রণার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। আমি তাই রূপার বিছানা-ছেড়ে উঠে পড়লাম। দেখি আমি একাই শুয়েছিলাম আমার একার বিছানায়। পাশের বাড়িতে (খুব পাশের নয়) মাইকে তখন বিসমিল্লা বাজছে। পিলু। দরদ-ছেনালী-মোহমেশানো পিলু। যারা বাজাচ্ছে তারা জানে না সানাই

কতটা বাজানো উচিত। না হলে ঐ মাঝরাতে পিলু। পড়শীর বিছানায় বউ না থাকলে পিলুর ঐ ছেনালী, ঐ মজলিশ তাতে আগুন ধরায়। আমি চোখে জল দিয়ে এসে ফের শুলাম। আমি তখন বন্যার কাছে বসে। ও গাইছে, যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর। বললাম, বন্যা তুমি আমায় তাড়িয়ে না দিলে আমি আছি। এই-খানেই। আমি না থাকলেও আছি যদি তুমি গাও। ও তখনও গাইছে। তবে আগের গান নয়। একটা রাবীন্দ্রিক ধ্রুপদ।

বন্যার স্বপ্নে ফিরে যাওয়া আমার বাঁচার চেষ্টা। অমিতের সঙ্গে এই নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছি। অমিত ভাল বোঝে। ও মানুষের দরদের মূল্য দেয়। বলল, তুমি ঠিক এক রাতের ঘোর হিসেবেই বন্যাকে দেখো না। ওকে দেখ একটা হাসির হর্‌রা খোঁজার জন্য। নইলে তোমার নিষ্কৃতি নেই। তুমি তো চাও ফিরে পেতে তোমার বাবার অ্যারিস্টোক্রেসি। তাহলে এত দুঃখবাদী থেকে যাও কেন? এক মুহূর্তের হালকা আনন্দ পাওয়ার মত দাবি তোমার আছে। এক লহমায় ভালবাসার মত মনও তোমার বর্তমান। বন্যা তোমার মিষ্টত্ব আনুক। স্বপ্ন পেরিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা কর। বল তো, আমিও তোমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাব।

জানি না কোথায় আমি যাব। যাওয়া আমার বিধির ব্যাপার। গতির প্রশ্ন নয়। আমি যেখানে যাই সেখানে আমার স্বপ্নই আগে পৌঁছয়। আমি পড়ে থাকি অনেক পিছনে। তাই আমার সমস্ত যাওয়াই একটা স্বপ্নকে ধরা। বা ধরার চেষ্টা। আমার পাওয়া কি না-পাওয়াও স্বপ্নের অন্তর্গত। আমার বেঁচে থাকাও বুঝি একটা স্বপ্নের ক্রমান্বয়

পরিণতি। সে স্বপ্নটা কিন্তু আমার থেকেও বেশি মা'স্ট রাইড স্বপ্নই টুকরো টুকরো ভাবে আমিতে তৈরি হচ্ছে। মাঝখানে অনেক ঝঞ্ঝা এলেও মা'র স্বপ্নই আমি। আমি যে নিজেকে খুন করতে পারি না তাও বুঝি অনেকটা মা'র স্বপ্নকে ভাঙতে চাই না বলে। মা এই স্বপ্নের নাম দিয়েছে দায়িত্ব। বলেছে, ওর বাবার কাছে আমার কথা আছে ওকে গড়ে দেব। ততদিন আমার বিশ্রাম নেই, মৃত্যু নেই। এবং এ কথা সত্য। মা'র দুর্বল শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি কোন ওষুধ না, পথ্য না। স্রেফ আমি। মা বলে দায়িত্ব। আমি বলি স্বপ্ন। দায়িত্ব মানুষ ঝেড়ে ফেলতে পারে। স্বপ্ন না দেখলে মারা পড়ে। মা'র স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকায় একটা মজা হলো, একটা ভয়ঙ্কর ভালবাসার আধারে মানুষ হওয়া। আর সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে যা উঠল তা চাপা পড়ল অন্য একজনের ভালবাসায়। কাজেই একলা একলা থেকেও আমার জীবন কিন্তু সম্পুর্ণরূপে দায়িত্ব হারিয়ে বসল না। আমি পড়লাম। পরীক্ষা দিলাম। অসুখে ওষুধ খেলাম। সমাজে সামাজিক হলাম। এ সবই যেন দায়িত্ব, ভারি রকম দায়িত্ব। বেঁচে থাকার দায়। মারা পড়ার ভয়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু এসমস্ত কিছুই আমি মাকে বলি না। কারণ তাতে ওঁর কষ্ট হবে। তাই সুখের সন্ধান আমাকেও করতে হয়। বন্যার মতন মেয়ের অনুসন্ধান করতে হয়। এক গাল হাসি নিয়ে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে আলাপ জমাতে হয়। যদি কখনও বন্যাকে পেয়ে যাই, তবে জানব এ হলো মা'র স্বপ্নেরই এক পরিণতি। আমি অন্যের দায়িত্বে আছি, অন্যের স্বপ্নেতে বিধৃত, একথা জেনেই আমার বাঁচা। যম জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আমিও কাকার মত নিরুত্তর।

॥ ৯ ॥

ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালে আবার দার্জিলিঙ গিয়েছিলাম। সেবারও সঙ্গে মা ছিল। দার্জিলিঙের তাজা পরিবেশে মাকে বহুদিন পর খুব তাজা, সমর্থ দেখলাম। টিফেনরী বাগানে বসে থাকত মা হরেক রকমের ফুলের মাঝখানে। পাহাড়ী শীতে মা'র গায়েও তখন বেশ লালচে ভাব ধরছে। মা বাগানে বসে কুলশীলহীন ভজন গাইত। আমি জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখে নোটবুকে লিখেছিলাম মা, তুমি ফুলের মধ্যে ফুল। মাও আমাকে খাতা-পেন্সিল হাতে দেখে বলেছিলো, তুমি তে কবিতা লেখ, তাই না? এই সুন্দর জায়গাটা নিয়ে কিছু লেখো না। আমি মনে মনে অট্টহাসি হেসেছিলুম। সত্যি, মা কি সরল। মা জানে সুন্দর জিনিস নিয়েই শুধু কবিতা লেখা হয়। সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করা কর্তব্য। সুন্দর ফুল দেখে মোহিত হওয়া মনুষ্যত্ব। মুখে কিন্তু বললাম, মা, কবিতা তো যখন তখন আসে না। মা তাতেও অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? এখানে কবিতা না এলে কোথায় আসবে? তারপর একটু থেমে বলল, তুমি বরং খেয়ে নিয়ে বেড়াতে যাও। মা হয়ত ভেবেছিল আমি কলেজের মেয়েটার চিন্তায় মশগুল, তাই কবিতা লিখতে পারছি না। আসল ব্যাপারটা মা জানল না। আর ক'দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে এমন বান্ধবীকে নিয়ে শেষবারের মতন সিনেমা হলে বসলে বোকা ছেলেদের যা মনোভাব হয়

(মানে যার একটা অন্য রকমের ছবি ব্রাউনিঙের 'লাস্ট রাইড টুগেদার') আমারও যেন ঠিক তাই হলো মাকে দার্জিলিঙে পেয়ে। ভাবলুম বাবার ম্যাজিকটা আমায়ও সেরে ফেলতে হবে এই অবসরে। যে মাকে দিনের পর দিন শরীরের কাছে রেখে মানুষ হচ্ছি, তাঁকে সেই অমোঘ কায়দায় পাবার সে কি চেষ্টা আমার। সন্ধ্যেবেলায় ম্যালের একটা বেঞ্চিতে বসে মাকে বললাম, তোমার মনে আছে ঐখানে আমি তুমি বাবা বসেছিলুম। মা'র কিন্তু কোন উত্তর নেই। ঘুরে দেখি মা'র চোখ দিয়ে হুস হুস করে জল গড়াচ্ছে। আমি জানলাম আমি হেরে গেছি। সন্তর্পণে উঠে পড়লাম সেখান থেকে। ভীষণ পাপী ঠেকল নিজেকে। সে রাত্রেই আমি বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন, মা বকলে অত কষ্ট পাবে না। উনি তো তোমায় খুব ভালবাসেন। ঐ জন্যই তো বকেন। দেখো না আমায় কেউ ভালবাসে না, তাই তো কেউ বকেও না।

মা আমাকে বকলে আমার কোন দুঃখ ছিল না। মা কেবল নিজের ওপরই সব বিড়ম্বনা তুলে নেয়। একটা গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে যার যাতায়াত। মনে হয় বাবার চরিত্রগুণের প্রাচুর্য মাকে বরাবরের মতই বোবা করে দিয়েছে। বাবাকে এতটুকু ক্রিটিকালী দেখার সামর্থ্য মা'র কখনো হয়নি। এবং বেশ বোকা-বোকা ভাবে বাবার সঙ্গিনী হয়ে মা বড় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। 'মুগ্ধা জননী' এই কয়েনিঙ্‌টা আমরা পেয়েছি। মা ছিলেন মুগ্ধা স্ত্রী। বাবা বিলেত থেকে চিঠিতে মাকে লিখেছিলেন, তুমি কেমন আছ! আমাকে সত্বর জানিও। কাকা বলতেন, আনন্দের ঘোরে মা এক

লাইনও চিঠিতে লিখতে পারেনি। কাকা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, তুমি কি লিখবে? মা বলল, লিখে দাও, আমার শত-সহস্র প্রণাম রইল আপনার জন্য। কাকা হেসে ফেলে-ছিলেন তাতে। বলেছিলেন, কিস্‌সু জিজ্ঞেস করার নেই তোমার? মা বলল, লেখ, শ্রীমা তোমার শরীর মন উজ্জ্বল রাখুন।

এই ছিল মা। সে মা'র কোন পরিবর্তনই হয়নি। আমি একবার পণ্ডিত রবিশংকরকে ইণ্টারভিউ করতে যাই। ফিরে এলে মা জিজ্ঞেস করল, তুমি ওনাকে প্রণাম করেছিলে তো? বললাম, হ্যাঁ। মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ঈশ্বরের কৃপা আছে ওঁর ওপর। উনি কি যে-সে লোক! মা'র এই কথাগুলোর একটা অদ্ভুত এফেক্ট হয়েছিল আমার ওপর। সেদিন থেকে আমি রবিশংকরজীর মধ্যে একটা পিতৃতুল্য মানুষ দেখতে শুরু করি। পরে যখনই ওঁর পায়ে হাত ছুঁইয়েছি, মনে হয়েছে বাবাকে প্রণাম করলাম। আমার প্রথমবারের কেসটা শুনে রূপা বলেছিল, তোমার মা হলেন ক্ষীরের নাড়ুর মতন মিষ্টি এবং পুষ্টিকর। উনি স্পর্শ করলে সব কিছু মিথ্‌ হয়ে যায়। তুমি ওঁর কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে জেনো তো। আমার ডেস্ক্রিপশন দিও। পরে জিজ্ঞেস কোর, এ ধরনের মেয়ে কিরকম হতে পারে। সে কথা আমি মাকে কখনও বলিনি। রূপার কোন কথাই মা জানত না। বাইরের লোক সম্বন্ধে মা'র ধারণা খুবই কম। মা মানুষ চেনে না, বলা যেতে পারে। শুধু একবার শক্তি সামন্তর 'আরাধনা' দেখে শর্মিলা সম্পর্কে বলেছিল, ওরকম মেয়েকেই তো সত্যিকারের মেয়ে বলি। কিন্তু মাকে বোঝান মুশকিল ছিল, সিনেমার ঐ চরিত্রগুলি জীবনে পাওয়া দুষ্কর।

বললে হয়ত বলত, কেন, মীরাবাঈ সারদা দেবী শ্রীমা—এঁরা কী মানুষ নয়? নাও ল্যাঠা! এমনভাবে বলবে এ সমস্ত কথা যেন্ মীরাবাঈ, সারদা মা—এঁরা সব আমার পাড়াতেই থাকেন। রাস্তার এপিঠ আর ওপিঠ। রূপা ঠিকই বলেছিল, উনি স্পর্শ করলে সব কিছু মিথ্ হয়ে যায়।

মাকে নিয়ে বাস করা আমার একটা প্রিভিলেজ বলা যেতে পারে। মা'র ঘরাণায় শব্দ আছে, মিথ্ আছে,আইডিয়া আছে। আবার মা'র স্বপ্নেও আমি। সেই আইডিয়া-গোছের আমি। যাকে বলি, মা'র আমি। আর রক্ত-মাংসের এই ক্ষুদ্র আমিটা বাড়িতে একা, নিঃসঙ্গ, আন্নোটিশড্।

ইটকাঠের বাড়িতে ও ছাড়া আর কেউ নেই। প্রায়ই মনে হয়, আমার যে আমিটা নিয়ে মানুষের এত মাথাব্যথা, তা বুঝি মা'র ঐ আইডিয়ার আমি। খোলস আমিটাকে কেউ চেনেও না, জানেও না। আইডিয়ার আমিকে কেউ বোঝাবার চেষ্টা করে না। কারণ ওটা কমিউনিকেট করতে জানে না। ওটাও একটা বিশেষ ধরনের অপদার্থ। তবে বেচারী ঘরকুণো আমিটা যে আদৌ আছে সেটাই তো কেউ জানে না। ওটার থাকার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কখনও দিতে পারব না। আমাকে স্পর্শ করেও কি রূপা সেটা বুঝেছিল?

পারলে হয়ত ওই পারত। জানি না।

পারমিতাদির শব্দের পরিবেশটাও আমাকে চমৎকৃত করে। আলতো ভাবে ছুঁয়ে ফেলা শব্দ সেগুলো নয়। বেশ বাঁধা, বেশ কঠিনভাবে ধরা। ওঁর কিছু কবিতায় আমি রূপার পালিয়ে যাওয়াকে ধরতে যাই। পারমিতাদি হয়ত বলবেন, ওটা পালান নয়। আত্মরক্ষা। ওটার দরকার

আছে। কিন্তু যে খোঁজে সেও তো জানে না সে আঘাত করতে পারে কি না। সে তো ভাবে সে আদর করতে চায়। যে যায় সেও বোধহয় জানে না সে কি রক্ষা করতে চলেছে। একটা মানসিকভাবে উলঙ্গা নারী কোথায় পালাতে পারে? কী আশ্রয় সে নিতে পারে? সে উত্তর পারমিতাদিও জানেন না। জানলেও বলে উঠতে পারবেন না। কারণ, সেটা অনির্বচনীয়।

ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ সে আড়ালে আবডালে ততক্ষণ তাকে নিয়ে জল্পনা, কল্পনা, কথার ঝগড়া। যে মুহূর্তে সে আবির্ভূত তখন সবাই হতবাক্, নিঃশব্দ। তখন শুধু দেখা, আর দেখা। কথা হচ্ছিল ভক্তদের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরের। কত ধরনের কথা, কত ফোঁড়ন কাটা, বাক্‌চাতুরী। শিবনাথ এলেন আর তখন সবাই তাঁকে দেখছেন, মনের বোধ তখন উপস্থিত। ঠাকুর বললেন, ভাবনার বস্তু উপস্থিত হলে মানুষ দর্শক। ঠাকুর দেখছেন শিবনাথকে। শিবনাথও দেখছেন। শিবনাথ প্রণাম জানালেন। ঠাকুর মাটিতে মাথা ছোঁয়ালেন। মনে মনে বললেন, ব্রহ্ম-বাদী, তোমায় আমি কত দেখেছি। মুখে বললেন, আমি ধন্য। তবে জানা গেল না কে কাকে কতটা খুঁজছিলেন। ঠাকুরের খোঁজার শেষ নেই। শুরু নেই, শেষ নেই। শিবনাথ বুঝলেন, মানুষ জিনিসটা বড় অদ্ভুত। ঠাকুরও যদি মানুষ হয় তাহলে···

রূপাকে পড়তে দিয়েছিলুম শ্রীমার বইটা। পরে দিলুম স্বামিজীর চিঠিগুলো। কোন বক্তব্য রাখেনি ও। কোন কথাও বলতে পারেনি পরে। শুধু বলেছিল, তুমি এগুলো রোজ পড়? বললাম, সময় পেলেই পড়ি। ও বলল, আমি

কত বোকা। আমি লেখাগুলোর মানেই খুঁজে পাই না। কেবল পড়ি আর কাঁদি, পড়ি আর কাঁদি। কাঁদলে কি কিছু বোধগম্য হয়? এক মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণের বিশ্বরূপের মত রূপা তখন আমার সামনে ভাস্বর। জানলাম ঠিকই বলেছিল পর্ণা। রূপা আমার মা-ই বটে। মা কখনও শ্রীমা পড়ে বোঝেন না। শুধু কাঁদেন। আর সে কি কান্না! ভাবলাম রূপার পা ছোঁব কিনা। কি এক অজ্ঞাত লজ্জায় নিজেকে সামলে নিলাম। মনে মনে বললাম, মা'র মানসিকতা তোমার এল কি করে? রূপা সে প্রশ্ন শুনতে পায়নি। তাই জবাবও দেয়নি। একেবারে মা'র মতন-অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রূপা। বলল ফের, কাঁদলে কি কিছু বোঝা হয়? আমার ঘোর তখনও কাটেনি, তাও অবস্থাটা হাল্কা করে নিতে বললাম, হয়, হয়, zান্তি পার না। মনে পড়ছে সে সন্ধ্যেবেলাটাতে আমি জোর করে ওকে তারকবাবুর ক্লাশ কাটতে বাধ্য করলাম। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের এক ঘুপচির রেস্টুরেণ্টে বসে বার বার চুমু দিতে লাগলাম। কারণ, ওকে যেমন-তেমন করে ফের রূপা করে ফেলা দরকার। না হলে, আমি দাঁড়াই কোথা!

যত চুমু দিই, চোখ দুটো লাল হয় আর শুধু আমাকে দেখে। দেখলাম আস্তে আস্তে ও রূপায় ফিরে আসছে। সামনের চা-কচুরি কিন্তু ততক্ষণে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। উষ্ণ রূপা আমার গলায় হাত রেখে বলল, তুমি আমায় বিয়ে করবে না?

ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলুম। তখন আমি ভারি ছোট; কাজেই আমার ঘুড়ি ওড়ান মানে দাদাকে, মণ্টুদাকে আর দাদার কত কত বন্ধুকে ধরাই দেওয়া। ঘুড়িটা দূরে নিয়ে

গিয়ে ছেড়ে দেওয়া। ওরা তখন টেনে নেয় আর ঘুড়িও সোঁ সোঁ করে চড়ে যায় আকাশে। সোনাটা কিন্তু ঘুড়ি ওড়াতে পারত না। ওকে ধরাই দিয়ে কোন মজা ছিল না। আকাশে যেই উঠল অমনি পড়ল গোত্তা খেয়ে। তবু বিশ্বকর্মা পুজোর সেই সকালটাতে আমার ছাদ থেকে নামবার ইচ্ছেই হচ্ছিল না। তাই সবাই যখন একে একে নেমে গেল, আমি সোনাকে ধরাই দিতে লাগলাম। সোনার দাদা বাড়ীর দরোয়ান ছিল। সোনা তখন আমাদের ওখানে থেকে কি একটা হিন্দী ইস্কুলে ক্লাশ ফাইভে পড়ত। সোনা বলল, সাহেব, আর একবার ধরিয়ে দাও। আমি দিলাম। ও টানতে পারল না। ঘুড়িটা ওপরে উঠে এক লাট খেয়ে এসে আমার বাঁ চোখে পড়ল। ব্যস! অন্ধকার।

মন্টুদা খবর পেয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী করে আমায় মেডিকালে নিয়ে গেসল ওরা। ডাক্তার বললেন, সাইট খুব হ্যাম্পার্ড হবে। তবে একেবারে অন্ধ হবে না। ডাক্তার সান্যালের তদারকিতে অনেকটা সামলে ওঠা গেল। উনি বাবাকে বললেন, ওর বছর পনের বয়স হলে একটা অপারেশন দরকার। এখন করলে সহ্য করতে পারবে না। বাবা বাড়ী ফিরে এসে প্রথম কেঁদেছিলেন সেদিন। অর্থাৎ আমি প্রথম তাঁকে সেদিন কাঁদতে দেখি। বলেছিলেন, ওকে কত বই পড়তে হবে। চোখটার ওপর চাপটা বড় বেশী হবে। রাত্তিরে বাবা আমার পাশে শুয়ে শুয়ে বললেন, সাহেব, তুমি বিলেতে পড়বে না গান-বাজনা শিখবে? বল। তোমার যা মন চায় বল। আমি কিছু মনে করব না। তুমি যা চাইবে তাই হবে। আমি বলেছিলুম একটু ধরা-ধরা গলায়, বাবা, আমি পড়ব।

সকালে উঠেছিলুম দেরী করে। এক চোখে ব্যাণ্ডেজ। বাবা সেই সাত সকালে উঠে আমার জন্য রাশি রাশি খেলনা আর বই কিনে এনেছেন দেখলাম। বইগুলোর মধ্যে একটা ছোটদের বাইবেল ছিল। বাবা তার থেকে যিশুর মিরাকেলগুলো পড়ে শোনালেন আমাকে। মৃত লাজারেস কবর থেকে উঠছেন। অন্ধ মানুষকে যিশু দৃষ্টি-দান করছেন। বড় হয়ে ভেবেছি, বাবা এত সিরিয়াস ছিলেন কেন। ছোট্ট ছেলের সামনে ঐভাবে আশা ফোটানোর কী দরকার ছিল সে সময়? কিন্তু তারও উত্তর পাই বাবার সমস্ত চরিত্রটার কথা ভাবলে। এক অর্থে বাবা ছিলেন ভিক্তর উগো। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মুহূর্তে তিনি আশ্রয় নিতেন কেতাবে। পড়াশুনোকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন জলপান করার লেভেলে। এতটা বিশ্বাস নিয়ে পড়লে মনে হয় ভগবদ্গীতার শব্দ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করা যায়। বাবার সেদিনের বাইবেল পাঠের তুলনা কোন পাদ্রীর পড়ার মধ্যে পাইনি। ফাদার আমোর সে কথা শুনে বলেছিলেন, ইয়োর ফাদার মাস্ট হ্যাভ সিন ক্রাইস্ট ওয়াকিং এ্যাট গেথ্সামেন।

সমর আবার আরতিকে ফিরে পেয়েছে। ওদের ছাড়াছাড়ি ছিল প্রায় চার বছর। বাড়ীর আপত্তিতে। তবে যাক সে সমস্ত কথা। সমর আরতিকে ফিরে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম সমরকে, কীরকম লাগছে রে? ও বলল, একটা বিষণ্ণতা এসে গেছে রে মনে। এটা কেন হয় বল তো? বললাম, জানি না। তবে আমি কিন্তু খুব খুশী। যাক্, বেচারা বেঁচে গেল। শোবার আগেই ভাবছিলাম ওদের কথা। দেখি রূপা এসে সামনে দাঁড়িয়ে। এ যেন জেকবের

স্বর্গের সিঁড়ি দেখা। তাকিয়েছিলুম অবাক হয়ে। রূপা বলল, তুমি তোমার মনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছ কেন? আমায় ঢুকতে দাও। দেখ বাইরে কী বৃষ্টি পড়ছে। আমি বললাম, কৈ না তো? ওটা তো খোলা হা হা করছে। ও বলল, ছিঃ! মিথ্যুক। ঐ দেখো না একটা ছিটকিনি ঠাসা। তাই তো! একটা ছিটকিনি কে মেরে রেখেছে ওখানে। বললাম, রূপা ফিরে যেও না। আমি এক্ষুনি খুলে দিচ্ছি ওটা—বলে খুলতে গেলাম। কিন্তু ও ছিটকিনিটা তো আমার হাতের নাগালের বাইরে। ভাবলাম আমি এত লম্বা মানুষ, আমারও হাত পৌঁছচ্ছে না কেন। একটা লাফ দিলাম। বাইরে রূপা ভিজে কাক হচ্ছে যে! আবার একটা লাফ। ফের একটা। আবার। চেঁচিয়ে বললাম, রূপা, একটু দাঁড়াও। ও বলল, শীত করছে। আমি লাফ দিলাম। বললাম, খুলে ফেললে তোমায় আবার উষ্ণ করে দেব। বলে আবার লাফ। এবারে ঘুমই ভেঙে গেল। শুনি শালা পাড়ার ঐ লোকটার বাড়ীতে আজও মাইক চলছে। আর সেই পিলু। ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে আহাম্মক।

॥ ১০ ॥

সত্যজিতের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' দেখে প্রশ্ন জেগেছিল সিদ্ধার্থ কে ? ওকি আমার যুগের মানুষের জীবন থেকে টুকে নেওয়া কোন ছবি ? নাকি ও মধ্যবয়স্ক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই কোন অস্ফুট আফশোষ ? এ প্রশ্নের উত্তর আমি মানিকবাবু কি সুনীলের কাছে চাইনি। নিজেই একটা বেঁকাচোরা কবিতার মধ্যে সেটা বসিয়ে সুনীলবাবুর টেবিলে রেখে এসেছিলাম। তখন 'দেশ'-এর কবিতার জগৎ বলতে আমার সুনীলকেই বোঝাত। এবং যথাসময়ে সুনীলবাবু সে কবিতাটি 'সবিনয় নিবেদন' করে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। আমি চিঠি পড়ে প্রাণ খুলে হেসেছিলুম। যাক্, তাহলে সুনীলবাবুও আমার পাগলামিটা ধরতে পারেননি। আচমকা সুনীলকে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র ঐ ইন্টারভিউয়ারদের চেহারায় দেখতে পেলাম ভেতরে ভেতরে। আসলে এঁরা কেউই সিদ্ধার্থদের চোখে দেখেন না। অনুমান করেন। সিদ্ধার্থ তার সমস্ত জীবন-যন্ত্রণা নিয়েই কিন্তু একটা অনুমিত চরিত্র। স্বপ্নে ধরা। বাস্তবে ছোঁয়া নয়। আমার জানা একটা সিদ্ধার্থ সুইসাইড করেছিল। তাকে কেউ নজরই করেনি। আর ওদের ট্র্যাডিশনের প্রথম চরিত্র তো রাজত্ব ত্যাগ করে এমন একাকিত্বে গিয়েছিলেন যে দুঃখবাদীদের কাছে তিনি একটা রীতিমত ফ্যাশন হয়ে উঠলেন। ওঁর ফ্যাশনটাই সবাই নিলে। ওঁর আলোটুকু বটতলাতেই রইল। উনি অবশ্য

কারোকে দোষ দিলেন না। নিজেই জ্বললেন দীপ হয়ে। সো করোসি দীপং আত্মানং।

এ সমস্ত জেনেই তন্দ্রা বলেছিল, তুমি নিজেকে কিসে ব্যক্ত করবে বল তো? বলেছিলাম আলোতে তো পারলাম না। তাই ছাইতে, ভস্মতে। ও বলেছিল, ছিঃ। তন্দ্রা তো নাচত, তাই ওর কথা বলার মধ্যে একটা ছন্দ লুকিয়ে থাকত। বলেছিল, তুমি লেখো না কেন? আমি বলেছিলাম, তুমি যখন নাচবে আমায় ডেকো। আমি রিভিউ লিখে দেবখন। ও বলল, আমার নাচ তো আমার অভিব্যক্তি। তা নিয়ে লিখলে তোমার প্রকাশ কোথায়? বলেছিলাম, কেন, তোমার এ্যাডমায়ারার হিসেবে আমার প্রকাশ! ও লজ্জায় গোল হয়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ পরে বলেছিল, আমার এ্যাডমায়ারার তো দুনিয়াময়। তুমি আমার ক্রিটিক হও। যার সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমি ঝগড়া করতে পারব। আমি দেখলাম, ওর কথায় ফ্রস্টের কবিতার মাধুর্য আছে। জেনেছিলাম ও ঝগড়ার অনুরাগে বাঁধা পড়তে চায়। যে বাঁধন গলায় পরলে আমি নিরুপায় হয়ে হাতড়াব, তন্দ্রা, তন্দ্রা, তুমি কি করছ? অসভ্যের মত দাঁড়িয়ে থেকে কি দেখছ? আমার গলায় এই দড়িটা পরিয়েছ কেন? দেখব ও তখন মিথ্যে রাগের রগরগানিতে বলছে, থামো তো বাপু, তখন থেকে চিল্লাচ্ছ। তখন হয়ত আমি বললাম, হ্যাঁ আমি তো চিল্লাই। আর তুমি যে ধেই ধেই করে নাচ। আর ও বলল, বেশ করব নাচব। তোমাকেও নাচাব। লিখে দাও না রিভিউয়ে, তন্দ্রা দেবী মণিপুরী নাচতে জানেন না। আমার বয়ে গেছে। আমি বললাম, কে লিখছে তোমার ঐ নাচ নিয়ে। আমারও বয়ে গেছে। তন্দ্রা বলল, ইস্!

কি রাগ রে আমার! আমি বললাম, রাগ করবই তো। একশ' বার করব। দুশ' বার করব। তিনশ'…তন্দ্রা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, থামো বাপু। তালটা রাখো তো। একটু বামাহেলটা সেরে নিই। আমি বললাম, ধুত্তোর! নিকুচি করেছে আমার। ও প্রায় কেঁদে ফেলে তখন। ও ভীষণ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে পছন্দ করে। বলল, যাও, আমার সঙ্গে কথা বলবে না তুমি। কোনদিনও বলবে না। আমি বললেও বলবে না। বলেই ভ্যাঁ করে কাঁদল!

ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ছোটবেলায় কাঁদত আমার ছোট্দিও। মেজদির কান্না চাপা কিন্তু গভীর। তবে বুঝি 'মেঘদূত'-এর উদ্বৃত্ত কান্না নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল মা। বলা যায় মা কাঁদতে ভালবাসে। ঐ কান্নাতেই মা প্রকাশ পায়। ওটাই মার শক্তি। বিভিন্ন শেডের দুঃখ-বেদনায় গড়া সে কান্না বেগম আখতারের ঠুংরীর মতই বিচিত্র। মাকে দেখেই বুঝেছি কান্নারও একটা রূপ আছে। একটা সুর আছে।

মায়া যখন বলেছিল ওর সঙ্গে এল-এস-ডি নিতে, আমি তখন 'না' বলেছিলাম। আমার ধরনের 'না' মানে 'পারলাম না'। ও তখন বলেছিল, তোমরা বাঙালীরা কেবল কাঁদতেই জান। অন্য কিছুতে তোমরা বেকার। মায়ার কথারও আমি প্রতিবাদ করিনি। কারণ, কাপুরুষেরা প্রতিবাদ করে না। ওটা ওদের ধর্ম নয়।

মায়া অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে। একটা অসাধারণ বিউটি। বয়স ২৪। কলকাতায় এসেছিল বেড়াতে। ওর ঐ ভারতীয় নামটা আমায় অবাক করেছিল। বলেছিলাম, বাঃ! বেশ নামটা তো তোমার। ও বলেছিল, জন্মের

থেকেই ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আমার। নামটা দেখলেই লোকে বুঝতে পারবে।

মায়া বায়না ধরেছিল ওকে সেতার শোনাতে হবে। তাই বন্ধু বাপীর একটা ঘরোয়া আসরে নিয়ে গেস্‌লাম ওকে। ও বেশ গাঁজা টেনেছিল সেদিন। তাতে আমি খুব বিরক্তই হয়েছিলাম। কিন্তু মুখে কিচ্ছু বলিনি। বাপী বাজিয়েছিল বাগেশ্রী। মায়া মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। বাজনা শেষ হলে ও গুণ গুণ করে গাইতে লাগল—"দ্য হিলস্‌ আর অ্যালাইভ উইথ দ্য সাউণ্ড অফ মিউজিক। দ্য সঙ্গস্‌ দে হ্যাভ সাঙ্গ্‌ ফর এ থাউজেণ্ড ইয়ার্স।" ভারি মিল ছিল গানটার বাগেশ্রীর সঙ্গে। বলেছিলাম, তোমার বেশ সুরজ্ঞান তো। ও বলল, সুরজ্ঞান নয় হে। গাঁজায় পাওয়ার অফ প্রমোশন। বল তো গাঁজার গুরুমশাই এল-এস-ডি দিয়ে তোমায় দেখাই, হাই ফিলিং কি জিনিস।

আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম ওর দিকে। বললাম, কিন্তু হাই হয়ে কি হবে? ও শুধু বলল, ভাইব্রেশন। বললাম, সেটা আবার কি? ও বলল, মানুষে মানুষে দেহাতীত মিলন। আমি কিন্তু দেহাতীত মিলন বলতে বিশেষ কিছু বুঝি না। তাই বললাম, সেটা কি স্পিরি-চ্যুয়াল কিছু? ও বলল, তা বলতে পার। তবে এটা সম্পূর্ণভাবে দেহের অতীত নয়। কারণ দেহের সংসর্গের মধ্যে দিয়েই এর প্রোগ্রেস। মে বি, উই উইল নিড টু বি অ্যাবসোলিউটলি টুগেদার টু নো হোয়্যার উই আর। দ্যাট ইজ, উই মে ইভন এণ্টার ইচ আদারস্‌ বডি দ্য ওয়ে অ্যানিমালস ডু। আমি বলেছিলাম, আইভ্‌ গট টু থিঙ্ক ওভার ইট। ও তখনই বলেছিল, ইউ ল্যাক কারেজ। ইউ

আর ফিট ফর মিয়ার সপি লাভ্-মেকিং। ইউ ল্যাক কারেজ। সেখানে উপস্থিত বন্ধু পল্লবও বলেছিল, ব্যাটা চান্স পাচ্ছিস ছাড়বি কেন? শালা কোন উজবুকে এ চান্স ছাড়ে। কী চেহারা বল্ তো। এত ভয় কিসের তোর? ভাবলাম, ভয়? কারেজ? মনে পড়ল মালরোর দুরবস্থা। নাৎসী ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে মালরো। কিন্তু উনি জানেন উনি মরবেন না। এই সেন্স অফ ইনভিন্সি-বিলিটি ওঁর কারেজ হলো। কিন্তু বেঁচে ফিরে এসে প্রশ্নও তুললেন, মরবেন না এটা জানাই কি কারেজ? মুখোমুখি বসলেন স্যাঁং এক্সুপেরীর সঙ্গে। প্রশ্ন, কারেজ কি? মালরো আর স্যাঁৎ এক্সুপেরী। মালরোর শরীরে তিন তিনটে বুলেট। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার ফেরা মালরো। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ওস্তাদ, বিমানচালক স্যাঁৎ এক্সুপেরী সামনে। প্রশ্ন, কারেজ কি? 'কঁদিসও উমেন'-এর লেখক বলছেন, কারেজ হলো···'ভল্ দ্য নুই'এর রচয়িতা বলছেন, সেটা···আমি বললাম মায়াকে, ইটস্ নট দ্যাট আই ল্যাক কারেজ। বাট আই, আই, আই···মায়া বলল, ইট ইজ সামথিং ইউ কান্ট্ এক্সপ্লেন। ইজ দ্যাট সো? বললাম মে বি। মায়া হাসল। সেই করুণার হাসি যা আমি সুনীতার মুখে দেখেছি। জানি, কোন কোন হাসিতে বউ, বেশ্যা, বান্ধবী, সব এক হয়ে যায়।

॥ ১১ ॥

কাকা মারা গিয়েছিলেন গ্রীষ্মকালে। মে মাসে। সে গ্রীষ্মটাই আমার এক ধরনের সামার অফ ফর্টি-টু হয়ে উঠেছিল। নিচের পড়ার ঘর ছেড়ে আমি অবনীদার চিলে কোঠার ঘরটায় পড়তে যেতুম। ওখানে কাকা আসতেন বাতাসে গন্ধে। যত না পড়তাম তাঁর বেশী ভাবতাম। কাকাকে, বাবাকে, অক্সফোর্ডকে। অবনীদা খুব পড়ুয়া লোক ছিলেন। আমার ঐ অধ্যবসায় দেখে বলেছিলেন, অত পড়লে ক্লাশের বইয়ের বাইরের কিছুও পড়তে হয়। বলে একদিন এনে দিলেন 'ভারত প্রেমকথা'। আমি তখনও বইটা ধরেছি কি ধরিনি, এমন সময় একটা আবিষ্কার করলাম। আমাদের পিছনের বাড়ীটাতে যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা থাকে তাদের যুবতী মেয়েটা প্রায়ই স্রেফ জাঙ্গিয়া পরে ঘরের মধ্যে চরে বেড়ায়। আর আমি দেখছি দেখেও ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পিউরিটান অবনীদাকে সে কথা বলাতে তো উনি চটে লাল। বললেন, ফের যদি তুমি ওসমস্ত দেখ তো আমি তোমাকে এখানে আর পড়তে দেব না। আমি আর কখনও সে কথা ওঁর কাছে তুলিনি। কিন্তু জ্যানিসের ঐ কাণ্ডকারখানা আমি দেখতাম রোজই। বায়োস্কোপ দেখার অনুরাগ নিয়ে।

জ্যানিস পরে জেনে গেসল আমি দেখি। এবং রোজই দেখি। কিন্তু ওকাজ থামাল না। জোরে জোরে এলভিস

প্রেসলী, কনি ফ্রান্সিস, কি ক্লিফ রিচার্ডের গান গেয়ে ও ঐ উলঙ্গ নৃত্য করত ওর ঐ ঘরটাতে। আমি দেখতুম। ওর একলা দর্শক। একদিন শেষে রাস্তায় দেখা। জ্যানিস দিদিদের সঙ্গে লোরেটোয় পড়ে। সেই সুবাদে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার বাড়ীতে এস না একদিন। বললাম, যাব। জ্যানিস বলল, দিদিদের কিন্তু বলবে না। আমি বুঝলাম, ওর ভয়টা কেন। তবু বললাম, না বলব না।

এর দু-তিন দিন পরে আমি পড়ছিলুম অবনীদার ঘরে। বেশ রাত্তির তখন। হঠাৎ শুনলাম, বেশ ক'জন জাহাজী লোক জ্যানিসের মা'কে গান গাইতে গাইতে চ্যাঙদোলা করে তুলে আনছে ঘরে। ওদের বাড়ীর পেছনের সিঁড়িটা আমার জানালার নীচে ছিল। দেখলাম, জ্যানিসের মা বেহুঁস। সে বয়সেও মদের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতাম না। ভাবলাম, নিশ্চয়ই পড়ে-টড়ে গেছেন কোথাও। একটু ভার ভার মান নিয়ে দেখতে লাগলাম কি হয়। দেখি, এক এক করে ঐ দস্যুগোছের লোকগুলো মহিলাটিকে প্রায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। যদিও তিনি একটু সুস্থ হবার ঝোঁক দেখাচ্ছেন, ঐ লোকগুলো ওঁকে দুমড়ে পিষ্টে সেটুকুও বরবাদ করে দিচ্ছে। তখন আবার ভদ্রমহিলা প্রায় নগ্না। আমি লজ্জায়, রাগে নেমে এলাম। জ্যানিসের জন্যই দুঃখটা বেশী হলো। ভয় হলো, এই লোকগুলোই যদি আবার ওকে ধরে। আমি ছাদে পড়া বন্ধ করে দিলাম।

কিছুদিন বাদে আমি নরেন্দ্রপুরে। ঐ অন্য ধরনের পরিবেশে আমি জ্যানিসের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। কি কথায় কি কথায় একদিন মেজদিই বলল, জানিস, আমাদের পেছনের জ্যানিস এখন দিল্লীর সব চেয়ে বড় হোটেলে বেলী ডান্সিং

করে। ও এখন কান্ট্রিজ বেস্ট ডান্সার, হোটেল স্ক্যিয়ারে। কি এক অব্যক্ত আনন্দে মনটা ছেয়ে গেল। যাক্ তাহলে জ্যানিস বেঁচে গেছে। ভগবান রক্ষে করুন ওকে। মুখে বললাম, কী ফিগার ওর! ও দাঁড়াবে না! দিদি বলল, তুই আবার মেয়েদের ফিগার-টিগার বুঝলি কবে থেকে? দিদিকে তো আর বলা যায় না, জ্যানিস ওর অ্যাপ্রেন্টিস পিরিয়ডে আমাকে নাচ দেখাত। মুখে বললাম, জ্যানিসকে রোজ দেখতাম, বুঝব না? দিদি বলল, তার মানে তুমি ভেতরে ভেতরে বেশ পেকেছ।

আমি সত্যিই ভেতরে ভেতরে পেকেছিলাম। যে কোন একলা মানুষের যেটা উপরি পাওনা। আমার দুটো একটা কথার মধ্যেই সেটা গুরুজনরা ধরে ফেলতেন। যেমন ছোট মামা একদিন বললেন, মেয়েরা ভেতরে ভেতরে সবাই অসভ্য —এ ফিলজফিটা তুমি কোথায় পেলে? বললাম, বইতে আর ইন্ট্রসপেক্সনে। মামা বললেন, তাহলে বল তো তোর মামী কি ফিরে আসবে কখনও? বললাম, শরৎচন্দ্রের হিসেবে দেখলে আসা উচিত। রবীন্দ্রনাথের কথায় ভাবলে আসতেও পারে, তবে সেই একভাবে নয়। অনেক টেন্সন নিয়েই আসবে। অনেক ঝামেলাও আছে। মামা বললেন, তখন ওঁর চোখে দু-ফোঁটা জল, তুই শিশু। তোর কথা সত্যি হোক। ও যদি টেন্সন নিয়েও আসে, আসুক। তবে তোর কথা সত্যি হোক। আমি বললাম, আমার কথা না মুনিদের বিবেচনা। মামা বললেন, মুনিদের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার শিশুর কথাতেই বিশ্বাস। আমার কিন্তু বেশ খারাপ লাগছিল মামার এই শিশু-শিশু বলাটা। কেন, বালকও তো বলতে পারেন। কিংবা আমি এত জানি,

আমাকে তো যুবকও বলা যেতে পারে। সত্যি, পুরুষ মানুষরা আমাকে বড় ছোট করে দেখে। পরে জেনেছি আমার মানসিকতার বয়োবৃদ্ধি বইয়ের গুঁতোয় নয়। কিছু কিছু মেয়েলোকের আল্‌গা কি সংবদ্ধ সংস্পর্শে। আমি মিশনে গিয়ে 'প্রেমকথা'র বেশ কিছু চরিত্রকে জ্যানিসের চেহারায় আঁকলাম। আর লোরেটো স্কুলের যে ছোট্ট মেয়েটি আমায় রোজ রোজ পেন্সিল ধার দিত (আমি কেবলই পেন্সিল হারাতুম বলে) তার আদলে। প্রমথ চৌধুরীর এক লেখায় এক কিশোরের লাভ্‌-এর কথা আছে। জয়শ্রী আমার ঠিক সেই জিনিস। আমার নরেন্দ্রপুরের জীবন কাটল দুটো এমন স্ত্রীলোকের স্বপ্নসঙ্গে, যাদের মধ্যে একজন আমার চেয়ে নিদেনপক্ষে আট-ন বছরের বড় আর অপরজনকে শেষ দেখেছি যখন তার মেয়েমানুষত্ব কিছুই গজায়নি। জয়শ্রীর সম্পর্কে আমার একটা স্যুব্‌ স্পিশি আয়েতের্ন্যসের ব্যাপার ছিল। ওটা আর কখনও যাবে না। জ্যানিসের সঙ্গ আমার সামার অফ ফর্টি-টু। দিদির কথাতেই বলতে হয়, আমি ছোটতেই বেশ পেকে গেসলাম। কাকা মারা গেলেন আর আমার ছোটবেলা শেষ হয়ে গেল।

অমিত জিজ্ঞেস করেছিল একবার, তোমার এই অল্প বয়সে অত বুড়োমানুষদের নিয়ে চিন্তা কেন? তুমি কি সত্যিই চাও জড় হয়ে যেতে? বলেছিলাম, যে বুড়োরা জড় হয়ে গেল তাদের নিয়ে আমি ভাবি কৈ? আমার বুড়োরা জড় হলেও ভেতরে ছটফট করে। নতুন নতুন বিশ্ব আঁকে নিজের স্তিমিত চোখের আলোয়। তুমি ইয়েটসের ছবি দেখেছ? ক্লান্ত দুটো চোখ দূরের দিকে চেয়ে আছে মোটা কাঁচের ফাঁক দিয়ে। ঐ চোখ আমাকে পাগল করে। ও

বলল, গুন্টের আইশের চোখেও তো সেই কবিতা, নয় কি ? আমি বললাম, দর্শনও বলতে পার। কিংবা অন্ন্ই। বিনোদবাবুর অন্ধতায়ও সেই ব্যতিক্রম। বলে, ফের চশমার কাঁচ মুছলাম। অমিত তখন আমার চোখের তল্লাশ নিচ্ছে।

মধ্য বয়সেই সেই বিলম্বিত খেয়াল এসেছিল কামুরও। তবে কামু চশমা পরতেন না। সুদর্শন কামু তরাণায় না পৌছেই আসর শেষ করলেন। ভাবটা এমন, অত কাণ্ড না করেও আমার কাজ খতম। এবার তোমরা মিলিয়ে নাও। অমিত হঠাৎ প্রশ্ন করল, কামুর চেহারাটা অদ্ভুত এ্যাট্রাক্টিভ্ না ? বললাম, উনি সিগারেট খেতে জানতেন। ওঁর চেহারার সঙ্গে একটা সিগারেট না থাকলে কামুকে অসম্পূর্ণ লাগে। যেমন চার্চিল উইথ সিগার। অমিত বলল, তোমার কি ? তুমি কী ছাড়লে অসম্পূর্ণ ? বললাম, চুল। উদ্‌ভ্রান্ত চুল। বলে চুলে হাত বোলালাম। অমিত বলল, তাহলে তুমি নিজের সম্বন্ধে কনশাস্। বললাম, আমার নিজের খাতিরে নয়। বাবা কাকা রূপা এই চুলে আঙুল ঘোরাতে ভালবাসত। মারও তাই।

অমিত বলল, তুমি চুলে পাক চাও না ? বললাম, চাই। ততটাই যাতে নিজেকে অন্যভাবে দেখতে পারি। ও বলল, তুমি তোমার চোখ সারাবে না ? বললাম, ইয়েটস্ যে এখনও আমাকে বিভোর করে। ও বলল, কিন্তু তুমি তো ইয়েটস্ নও। আর ইয়েটসেরও তো চোখ গিয়েছিল বার্ধক্যে। বললাম, ইয়েটসের চোখের দরকার ছিল। উনি কাজের কাজ করতেন। আমি ছাই কী করি। অমিতও বলল শেষে, তুমি লেখো। যা পার লেখো। যেমন ভাবে কথা বল ঠিক তেমন করেই। এবং আমি লিখলাম। অন্য

এক বন্ধু বলল, তুমি উপন্যাস লেখ তোমার যুগ নিয়ে। তোমার স্টাইলে। তোমার অনুভূতি দিয়ে। এবং আমি লিখলাম। এত লেখা আমার পোষায় না। আমার কোন লেখাই উপন্যাস হবে না। উপন্যাস কী আমি জানি না। অথচ লিখছি। আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই মুহূর্তে। তাও লিখছি। শব্দগুলো জোনাকির মত চরে বেড়াচ্ছে আমার চোখের সামনে। এই যা! এগুলো গেল কোথায়? এক দুই, তিন।···

নিজের মধ্যে উচ্ছন্নে যাওয়ার নেশাটা একা হওয়ায় প্রথম পা। পাগল হওয়াটাও বুঝি নিষ্কৃতি সে ক্ষেত্রে! পাগল হলে অনেক ইল্যুমিনেশন আসে। ক্লান্ত হয়ে বসলে কৈশোরের ঐ ইঁদুরটা আবার আসে। বিছানার নিচে কিচিরমিচির করে। ইয়েটসও একটা ইঁদুর নিয়ে পড়েছিলেন শেষ দিকে। ওঁর ঘরের সব চেয়ে জ্যান্ত জীব ঐ ইঁদুর। এলিয়ট বললেন, বালককে দিয়ে বই পড়িয়ে শোনাও তো ঐ বয়সের একটা অধ্যবসায়। আমার পাশে কচি কচি দুটো ভাগ্নে মাঝে মাঝে রাইমস্ পড়ে। বেশ মিষ্টি শোনায়—লিটল মিস্ মাফেট। স্যাট অন এ টাফেট। ইটিং হার ক্যর্ডস এ্যাণ্ড হোয়ে। দেন কেম এ বিগ স্পাইডার···থাম থাম! করে উঠলাম আমি। স্পাইডার না? কি বললি স্পাইডার? কাফ্কা কিসে মেটামরফোজড হয়েছিল জানিস তোরা? ওরা তত-ক্ষণে চলে গেছে বাইরে ব্যাট-বল খেলতে। আর ওরাই বা সে কথা জানবে কেন। তাই তো! কে মাকড়শা হবে, কে আরশোলা হবে কিংবা কে ফিলিপ রোথের মত স্ত্রীলোকের স্তন হওয়ার ধান্দা করবে সে কথা ওরা জেনে কি করবে? ওরা পড়াশুনো করে মানুষ হবে। ভাল ধরনের মানুষ

হবে। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে এই ভালমানুষ হওয়াটাই প্রসঙ্গ। অন্য কিছুই উচ্ছন্নে যাওয়া। কাকা মানলেন না সে কথা এবং নিজের কায়দায় উচ্ছন্নে গেলেন। যারা যেতে পারল না ঐ পথে তারা ঐ প্রস্থানের দিকেই চেয়ে বসে রইলেন। ঐ চেয়ে থাকাটাও এক সময়ে একটা প্রসঙ্গ হয়ে উঠল। ন যযৌ ন তস্থৌ।

॥ ১১ ॥

ছোট মামার চিন্তার আয়তি ছোট। কিন্তু মার মতই অনুভূতির সাগর। ছোট মামী একটা দেখবার মতই সুন্দরী মহিলা। মধ্য বয়সেও ওঁর কদর বাজারে কমল না। শুধু কদর কমে গেল মামার, মামীর কাছে। কারণ মামা যুগের সঙ্গে বেশী একটা বদলালেন না। তাছাড়া পুলিশে চাকরি করে মামার একটা পাথুরে প্রাচীনতাও তৈরী হয়েছিল। শেষে একদিন মামী রাগ করে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে, মামাকে ছেড়ে চলে গেলেন। মামার ছেলেপুলেরাও তখন বেশ বড়। মামা চোখে অন্ধকার দেখলেন। সময় কাটাতে আমাকে নিয়ে লাইটহাউসে গেলেন। কিন্তু ছবি তিনি দেখলেন না। চোখ বুঁজে কাঁদলেন। বেরিয়ে এসে আমরা ঢুকেছিলাম ফেরাজিনিতে। তখন ওখানে ভারি রগুড়ে আসর জমত লম্পটদের। গান গাইছিল একটা সেডাক্টিভ ফিরিঙ্গি মেয়ে। মামা ওই পরিবেশেই কাঁদছেন। একটা ছোট্ট ছেলের মতন। হঠাৎ বললেন, তোর কি মনে হয় ও ফিরে আসবে? আমি চুপ; শুধু মনে মনে বললাম, যদি আসেও বা, তুমি কি তাকে নেবে? মামাই ফের কথা বলল, ও এলেও আমি ওকে কি নিতে পারব? আমি চুপ; শুধু মনে মনেই বললাম, সে কি আসবে আদৌ! মামা ফের বললেন, ও আসবেই আসবে। এবং পাঁচ বছর পর মামী এসেছিল। নানান ভাবে। মামা তখনও কাঁদছেন।

রূপা যখন শেষ দেখার দিন বলল, আমি যদি ফিরে আসি কখনও, তুমি আমায় নেবে তো ? আমি চুপ ছিলাম। জানি, সত্যিকারের মেয়েমানুষের কোন ঘর নেই। তারা শুধু ঘরই খোঁজে। তারা ফিরে আসে না ঠিক ; তারা ফিরে ফিরে আসে। মামীর মত নানা ভাবে। নানান রূপে, নানান রসে, নানান গন্ধে। রূপা এখনও আসে সুচিত্রা মিত্রতে, বিলিতি পাত্রাতে, সত্যজিতে, চিনে বাদামে, কফি হাউসে। ফিরে ফিরেই আসে। তবে যদি মামীর মতই এসে আমার পাঞ্জাবীর বোতাম ধরে বলে, এ্যাই, আমায় দেখ ? তখন, তখন, তখন কি আমি আমার ভাবনার দর্জিই হয়ে যাব! বলব, নাও চটপট কর। মাপ নিই। আর একি, তোমার কোমর অনেক স্থূল হয়ে গেছে যে! তোমার থাইয়ে অনেক মেদ জমেছে। তোমার স্তন তুটি আর শাঁখের মত নয়। আমার কল্পনার জামাটা তোমার শরীরে টাইট হয়ে যাবে। এপাশ ওপাশ দিয়ে শরীর বেরিয়ে থাকবে।

অথচ কাকাই বলতেন, ছেলেবেলায় হারানো প্রেয়সীকে বুড়ো বয়সে ফিরে পাওয়াই স্বর্গ। যা কেউ পায় না। আর যে পেল সে তো ততদিনে জরদ্গব। তার ভেতরের সুধাটুকু তখন উদ্বাস্তু।

বাবা শেষ বয়সে ছাত্রাবস্থা ফিরে পেয়েছিলেন। এবং যে চাঞ্চল্যে পেলেন, তার ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণ আর নীৎসের সহাবস্থানে। এ তুটো নাম পাশাপাশি থেকে কেবলই স্মরণ করায় বাবা কিছু খুঁজছিলেন।

মাও খোঁজে। ঈশ্বর এবং আমাকে। যা কেবল মা-ই পারে। যখন গভীর রাতে মা এসে মাথার কাছে বসে তখন

বুঝি, আমার বেঁচে থাকার অঞ্চলটায় স্নেহের পলি মাটি বিছিয়ে আছে। আমায় না বুঝেও মা আমাকে আচ্ছন্ন করে। আমার অন্তর্গত দুঃখের খবর না রেখেও আমার অস্তিত্বের দ্বারা ক্লান্ত হয়। কিছু কিছু স্বপ্ন যেমন শরীরকে দুর্বল করে, দিনের সঙ্গতিকে হাল্কা করে, আমিও তাই ঘটাই মার জীবনচরিতে। কিন্তু এই ঘোরেই মা বেঁচে থাকতে চায়। একবার বলেও ফেলেছিলেন কাকে যেন, পরের জন্মেও আমি ওর মা হতে চাই।

আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। তবু কোন মতে উঠে ঠাকুরের ছবিতে মাথা ছোঁয়াতে গেলাম। ঠাকুর হাসছেন, ওঁর সেই পেটেণ্ট ফোগলা হাসি। বলছেন, সংসারে টিকে থাকবি পাকাল মাছের মতন। বললাম, আমি মাছ চিনি না। পাকাল মাছটা কি চীজ্? ঠাকুর বললেন, আমার সমস্ত ভক্তরাই জানে, কেবল তুই জানলি না। বললাম, এই রাত্তিরে মাছের কথা বলছ ঠাকুর। আমার যে খিদে পাবে। উনি হাসলেন, হ্যাঁ, মাছ হতে পারবি না বলেই তো খিদে পাবে। জলে মাছ হলে তোর জল পিপাসাও রুখে যেত। তবে জলেই যদি রইবি তবে জলটা একটু ঘোলা করেও তো দেখবি। ঐ যে কালীর ছবিটা তোর ঘরে সেটার পায়েই শুধু মাথা ঠেকাবি? মার বেণীতে হাত ছোঁয়াবি না? নাকি ঐ লাল জিব দেখে ভয় হয়? আমি বললাম, সে কাজ তো তুমিই করেছ ঠাকুর। আমি বইতে পড়েছি। আর তাছাড়া তলায় শিব গড়াগড়ি দিচ্ছে। চটে যাবে। ঠাকুর বললেন, শিব তো সবাই। তুই, আমি, চুনে, ঘেঁটু, সব্বাই। বলেই ঠাকুর ডাকলেন, শিবোহং শিবোহং। আমিও লাইট নিবিয়ে দিলুম।

মাঝ রাতে চোখে জল দিতে উঠলাম। দেখি মা চুল বাঁধছে। ভাবলাম এত রাতে আবার চুল বাঁধা কিসের? জিজ্ঞেস করতেই মা বলল, কাল কালী পুজো। একটু বই পড়ব এখন। এলো চুলে ও কাজ করতে নেই। আমি মুখে জল ছিটিয়ে এসে শুয়েছি। বাইরের হাওয়াটা আজ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঠেকছে। হাত বাড়িয়ে কাঁচের সার্সিটা টেনে দিতে গেলাম। আচমকা কে হাতটা জানালার ওপিঠ থেকে চেপে ধরল। ভয়ে শিরশির করে উঠল শরীরটা। চোর নাকি? খুনে পাগল না তো? ভয়ে ভয়ে তাকালুম কিন্তু ঠিক স্পষ্ট হলো না কিছু। অমাবস্যার আগের দিনের রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এবার মুখ বাড়ালাম, বড় করে চোখ মেললাম। দেখি, আমার হাত চেপে ধরে জানালার ওপিঠেও আমি। ও আমিটার চোখে জল। টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়ছে চোখ বেয়ে। ইস্! ওর জামাটাও ভিজে গেছে। ও কিছুই বলে না দেখি। আমিই বললাম, এ্যাই হাত ছাড়। বল তুমি কি চাও। ও তবুও কিছু বলে না। আমিই বললাম শেষে, তুমি কাঁদছ কেন, তোমায় তো আমি ঠকাইনি। তুমি তো নির্বিঘ্নে আছ। তোমায় তো কেউ ঘাঁটায় না। তোমার কি দুঃখ? ল্যাঠা যত তো আমাকে নিয়ে। ও কিন্তু তবুও কিছু বলল না। শুধু তাকাল চোখ বড় বড় করে আমার দিকে। এই প্রথম। তবে হাত ছাড়ল না। আমি বললাম, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি আমার। বলে আমিই কাঁদলুম।